Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআনের আলোকে শয়তান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মিশকাতুল আরওয়া

রোলঃ 23100121206

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআনের আলোকে শয়তান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মিশকাতুল আরওয়া

রোলঃ 23100121206

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কুরআনের আলোকে শয়তান " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মিশকাতুল আরওয়া, আইডিঃ 23100121206 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কুরআনের আলোকে শয়তান " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

মিশকাতুল আরওয়া

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

মিশকাতুল আরওয়া

আইডিঃ 23100121206

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা : 6

১.১ শয়তান শব্দের অর্থ: 6

১.২ ইবলিসের পরিচয়: 7

১.৩ শয়তানের সৃষ্টি : 8

১.৪ কুরআনে শয়তানের পরিচিতি: 9

অধ্যায়–৩ : আদম (আ.) ও ইবলিসের ঘটনা: 12

৩.১ : আদম (আ.)-এর সৃষ্টি 12

৩.২ : সিজদার নির্দেশ: 14

৩.৩ ইবলিসের অবধ্যাতা: 15

৩.৪ অহংকারের পরিণতি: 16

অধ্যায়-৪ : শয়তানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : 18

৪.১: মানুষকে পথভ্রষ্ট করা: 18

৪.২ ঈমানের দূর্বলতা: 20

৪.৩ ইবাদত থেকে দূরে রাখা: 22

পাঠ–৪.৪ : গুনাহকে সুন্দর করে দেখানো: 24

৪.৫— ধীরে ধীরে গুনাহের দিকে নিয়ে যাওয়া: 26

৫ম অধ্যায়: শয়তানের কৌশল ও প্রতারণা 29

৫.১ : ওয়াসওয়াসা 29

৫.২ মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি: 31

পাঠ–৩ : সময় নষ্ট ও গাফেল বানানো: 33

৫.৪ : মানুষকে হতাশ করা: 35

৬ষ্ঠ অধ্যায়: মানুষের জীবনে শয়তানের প্রভাব 38

৬.১ ঈমানের উপর প্রভাব 38

৬.২ – ইবাদতে অলসতা: 39
৬.৩– পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা:..41
৬.৪– অন্তরের কঠিনতা ও গাফেলতি 42
৭ম অধ্যায়: শয়তান ও নফসের সম্পর্ক 45
৭. ১: নফসের পরিচয়: 45
৭.২ – শয়তান নফসকে ব্যবহার করে: 47
৭.৩– নফস ও শয়তান একসাথে কাজ করে:..48
৭.৪– নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে আত্মসংযমের প্রয়োজন 50
৮ম অধ্যায়: শয়তান থেকে বাঁচার উপায়: 52
৮.১– আল্লাহর স্মরণ (যিকির) 52
৮. ২– সালাত ও কুরআন তিলাওয়াত:..53
৮. ৩– দোয়া ও ইস্তিগফার : 55
৮.৪– সৎ সঙ্গ: 58
৯ম অধ্যায়: কিয়ামতের দিন শয়তানের পরিণতি..60
৯.১– শয়তানের অস্বীকার: 60
৯.২ – অনুসারীদের বক্তব্য — 61
৯.৩ জাহান্নামের শাস্তি : 63
৯.৪– শিক্ষণীয় বিষয়: 64
১০ম অধ্যায়: বর্তমান সমাজে শয়তানের প্রভাব 67
১০.১– সোশ্যাল মিডিয়া ও শয়তানের প্রভাব: 67
১০.২–অশ্লীলতা, চোখের গুনাহ ও গাফেলতি :..68
১০.৩ মূল্যবোধের অবক্ষয় : 71
উপসংহার —)..73

ভূমিকা :

মানব জীবনের সবচেয়ে বড় অদৃশ্য শত্রু হলো শয়তান। সে মানুষকে সরাসরি বাধ্য করে না, বরং ধীরে ধীরে কুমন্ত্রণা (ওয়াসওয়াসা) দিয়ে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। কুরআনে শয়তানকে স্পষ্টভাবে মানুষের শত্রু হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাকে অনুসরণ না করার জন্য কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে।

শয়তানের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে ঈমান থেকে দূরে রাখা, গুনাহের দিকে আকৃষ্ট করা এবং শেষ পর্যন্ত জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া। সে মানুষের অন্তরে সন্দেহ, অলসতা, অহংকার ও হতাশা সৃষ্টি করে ইবাদত থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে।
কুরআনে আদম (আ.)-এর ঘটনা থেকে শুরু করে বহু স্থানে শয়তানের চরিত্র, তার কৌশল এবং মানুষের প্রতি তার শত্রুতা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, যাতে মানুষ সচেতন থাকে এবং নিজেকে রক্ষা করতে পারে।

এই প্রবন্ধে কুরআনের আলোকে শয়তানের পরিচয়, তার উদ্দেশ্য, কৌশল এবং তার থেকে বাঁচার উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, যাতে পাঠক শয়তানের প্রকৃতি বুঝে সঠিক পথে চলতে পারে।

১.১ শয়তান শব্দের অর্থ:

শয়তান (شيطان) আরবি শব্দ। এটি ‘শাতানা’ (شَطَنَ) মূলধাতু থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ সত্য ও কল্যাণ থেকে দূরে সরে যাওয়া। শাব্দিকভাবে শয়তান বলতে বিদ্রোহী, অবাধ্য, অভিশপ্ত, আল্লাহর রহমত থেকে দূরবর্তী এবং পথভ্রষ্টকারীকে বোঝায়।

পরিভাষায়:

শয়তান বলতে এমন সত্তাকে বোঝায়, যে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে এবং মানুষকে পথভ্রষ্ট ও গুনাহের দিকে প্ররোচিত করে। কুরআনে শয়তানের প্রধান রূপ হিসেবে

'ইবলিস'-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সে জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং অহংকার ও অবাধ্যতার কারণে আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত হয়।

শয়তান বলতে এমন সত্তাকে বোঝায়, যে নিজে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয় এবং অন্যদেরও বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে।মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে, সত্য পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং স্রষ্টার অবাধ্যতার দিকে ধাবিত করে।

১.২ ইবলিসের পরিচয়:

ইবলিস হলো শয়তানদের প্রধান এবং মানবজাতির প্রকাশ্য শত্রু। পবিত্র কুরআনে তাকে এমন এক সত্তা হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে আল্লাহ তাআলার আদেশ অমান্য করে অহংকারবশত আদম (আ.)-কে সিজদা করতে অস্বীকার করেছিল। এর ফলে সে আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত ও অভিশপ্ত হয়।
কুরআনের ভাষায়, ইবলিস জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

অর্থ: আর যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর। অতঃপর তারা সিজদা করল, ইবলীস ছাড়া। সে ছিল জিনদের একজন। সে তার রবের নির্দেশ অমান্য করল। তোমরা কি তাকে ও তার বংশকে আমার পরিবর্তে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে, অথচ তারা তোমাদের শত্রু? যালিমদের জন্য কী মন্দ বিনিময়!
(সূরা আল- কাহাফ: ৫০)

ইবলিস পূর্বে অত্যন্ত ইবাদতগুজার ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু অহংকার ও আত্মগরিমার কারণে সে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে। যখন আল্লাহ তাআলা আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করে ফেরেশতাদের সিজদা করার নির্দেশ দেন, তখন সবাই সিজদা করলেও ইবলিস তা অমান্য করে। সে বলেছিলঃ

“আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা।”

— (সূরা আল-আ‘রাফ : ১২)

ইবলিসের এই অহংকার, হিংসা ও অবাধ্যতার কারণেই সে আল্লাহর অভিশাপে অভিশপ্ত হয়। এরপর সে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষকে বিভ্রান্ত করার অবকাশ চায় এবং মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করে। আল্লাহ তাআলা তাকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেন।

১.৩ শয়তানের সৃষ্টি :

আল্লাহ তাআলা তাঁর অসীম ক্ষমতায় বিভিন্ন সৃষ্টিকে ভিন্ন ভিন্ন উপাদান দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। কোরআন হাদিস থেকে জানা যায় যে শয়তান আল্লাহর একটি সৃষ্টি তার বুঝজ্ঞান ও চলন শক্তি আছে।

মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে, ফেরেশতাদের সৃষ্টি করা হয়েছে নূর বা আলো থেকে এবং জিন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে আগুনের শিখা থেকে। শয়তান যেহেতু জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত, তাই তার সৃষ্টিও আগুন দ্বারা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

“আর জিনকে তিনি সৃষ্টি করেছেন অগ্নিশিখা থেকে।”

— সূরা আর-রহমান : ১৫

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

“ফেরেশতাদের সৃষ্টি করা হয়েছে নূর থেকে, জিনদের সৃষ্টি করা হয়েছে আগুনের শিখা থেকে এবং আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে।”— সহিহ মুসলিন

শয়তানের সৃষ্টি মানুষের জন্য একটি পরীক্ষা স্বরূপ। আল্লাহ তাআলা মানুষকে বিবেক, জ্ঞান ও সৎপথ অনুসরণের ক্ষমতা দিয়েছেন। অন্যদিকে শয়তান মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিয়ে তাকে গুনাহ ও অবাধ্যতার দিকে আহ্বান করে। এর মাধ্যমে মানুষ যাচাইয়ের সম্মুখীন হয় যে, সে আল্লাহর আনুগত্য বেছে নেয় নাকি শয়তানের প্ররোচনায় পথভ্রষ্ট হয়।

জিন জাতির মতো শয়তানও অদৃশ্য সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। মানুষ তাকে দেখতে না পেলেও সে মানুষের চলাফেরা ও দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে।

১.৪ কুরআনে শয়তানের পরিচিতি:

পবিত্র কুরআনে শয়তানকে মানুষের চিরশত্রু হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে পাপ, অন্যায়, অশ্লীলতা ও বিভ্রান্তির দিকে আহ্বান করে। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে শয়তানের স্বভাব, উদ্দেশ্য ও কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, যাতে মানুষ তার ধোঁকা থেকে সতর্ক থাকতে পারে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।”
— সূরা আল-বাকারাহ : **১৬৮**

এই আয়াতের মাধ্যমে বোঝা যায়, শয়তান কখনো মানুষের কল্যাণ চায় না; বরং সে সর্বদা মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করে।

কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শয়তান মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় এবং পাপকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“অতঃপর শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল...”
— সূরা আল-আ‘রাফ : ২০

শয়তানের অন্যতম কৌশল হলো মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে দেওয়া। সে মানুষের মাঝে ভয়, হতাশা ও সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং অন্যায় কাজে উৎসাহিত করে।

আল্লাহ তাআলা *বলেন*—

‘শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়।”
— সূরা আল-বাকারাহ : ২৬৮

এছাড়াও কুরআনে বলা হয়েছে, শয়তান মানুষকে ধাপে ধাপে বিভ্রান্ত করে। তাই আল্লাহ তাআলা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন।

“তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।”
— সূরা আল-বাকারাহ : ১৬৮

শয়তানের আরেকটি পরিচয় হলো, সে অহংকারী ও অবাধ্য। আদম (আ.)-কে সিজদা করার নির্দেশ দেওয়া হলে সে অহংকারবশত অমান্য করেছিল। এর ফলে সে আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“সে বলল, ‘আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা।’”
— সূরা আল-আ‘রাফ : ১২

হাদিসেও শয়তান সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

“নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের শরীরে রক্তপ্রবাহের ন্যায় চলাচল করে।”
— সহিহ বুখারি, হাদিস :

এই হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, শয়তান সর্বদা মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেওয়ার চেষ্টা করে। তাই একজন মুমিনের উচিত আল্লাহর স্মরণ, কুরআন তিলাওয়াত ও ইবাদতের মাধ্যমে শয়তানের অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকা। আল্লহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা শয়তানের অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকার।

পরিশেষে বলা যায়, কুরআনের আলোকে শয়তান হলো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু, যার প্রধান উদ্দেশ্য মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করা। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত শয়তানের ধোঁকা সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং সর্বদা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা।

অধ্যায়-৩ : আদম (আ.) ও ইবলিসের ঘটনা:

৩.১ : আদম (আ.)-এর সৃষ্টি

আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেছেন। মানবজাতির প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী হলেন হযরত আদম (আ.)। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আদম (আ.)-এর সৃষ্টি সম্পর্কে (বিস্তারিত) আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান দিয়ে সৃষ্টি করেন, যা অন্য সৃষ্টির তুলনায় মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

"আর যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।'"
— সূরা আল-বাকারাহ : ৩০

এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহ তাআলা মানুষকে পৃথিবীতে দায়িত্বশীল প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিল মাটি থেকে। কুরআনে কোথাও বলা হয়েছে কাদা থেকে, কোথাও শুকনো মাটি থেকে। এর মাধ্যমে মানুষের সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপ তুলে ধরা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

"নিশ্চয়ই আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি শুকনো ঠনঠন শব্দযুক্ত মাটি থেকে, যা ছিল কালচে কাদামাটি হতে।"
— সূরা আল-হিজর : ২৬

আরও বলেন—

“তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন পোড়ামাটির ন্যায় শুকনো মাটি থেকে।”
— সূরা আর-রহমান : ১৪

আল্লাহ তাআলা আদম (আ.)-এর দেহ গঠন সম্পূর্ণ করার পর তাঁর মধ্যে রূহ ফুঁকে দেন। এর মাধ্যমে মানুষ সম্মানিত ও জীবিত সৃষ্টিতে পরিণত হয়।

“অতঃপর যখন আমি তাকে পূর্ণাঙ্গ করব এবং তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে রূহ ফুঁকে দেব...”
— সূরা সাদ : ৭২

আদম (আ.)-কে শুধু সৃষ্টি করাই নয়, বরং তাঁকে জ্ঞানও দান করা হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁকে বিভিন্ন বস্তুর নাম শিক্ষা দেন, যা ফেরেশতাদেরকেও দেওয়া হয়নি। এর মাধ্যমে মানুষের জ্ঞানের মর্যাদা প্রকাশ পায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“আর তিনি আদমকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন।”
— সূরা আল-বাকারাহ : ৩১

এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। তাই মানুষের উচিত আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানকে সৎপথে ব্যবহার করা।

আদম (আ.)-এর সৃষ্টি আল্লাহর অসীম কুদরত ও হিকমতের উজ্জ্বল নিদর্শন। মানুষকে সম্মানিত সৃষ্টি হিসেবে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে, যাতে সে আল্লাহর ইবাদত করে এবং ন্যায় ও সত্যের পথে জীবন পরিচালনা করে।

৩.২ : সিজদার নির্দেশ:

আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ তাআলা তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের জন্য ফেরেশতাদের তাঁকে সিজদা করার নির্দেশ দেন। ফেরেশতারা আল্লাহর আদেশের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করে সঙ্গে সঙ্গে সিজদা করেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

"আর যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, 'তোমরা আদমকে সিজদা করো', তখন সবাই সিজদা করল..."

— *সূরা আল-বাকারাহ : ৩৪*

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, আদম (আ.)-কে আল্লাহ তাআলা বিশেষ মর্যাদা প্রদান করেছিলেন। ফেরেশতারা নিষ্পাপ সৃষ্টি হওয়ায় তারা কখনো আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না। তাই তারা বিনা দ্বিধায় সিজদা করেন।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

"তারা আল্লাহর কোনো আদেশ অমান্য করে না; বরং যা আদেশ করা হয় তাই পালন করে।"

— *সূরা আত-তাহরিম : ৬*

সিজদার এই ঘটনা মানুষের মর্যাদা ও জ্ঞানের গুরুত্ব প্রকাশ করে। আল্লাহ তাআলা আদম (আ.)-কে জ্ঞান দান করেছিলেন এবং সেই জ্ঞানের কারণেই তিনি ফেরেশতাদের উপর মর্যাদা লাভ করেন।

এছাড়াও এই ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহর আদেশ মানার গুরুত্ব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ফেরেশতারা আল্লাহর নির্দেশ মানার মাধ্যমে আনুগত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

সিজদার নির্দেশের ঘটনা মানবজাতির সম্মান, জ্ঞানের মর্যাদা এবং আল্লাহর আদেশ পালনের গুরুত্বকে স্পষ্ট বুঝা যায়।

৩.৩ ইবলিসের অবধ্যাতা:

আল্লাহ তাআলা যখন ফেরেশতাদের আদম (আ.)-কে সিজদা করার নির্দেশ দেন, তখন সবাই সিজদা করলেও ইবলিস সিজদা করতে অস্বীকার করে। ইবলিস ছিল জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত। সে দীর্ঘদিন ইবাদত করার কারণে ফেরেশতাদের সাথে অবস্থান করত। কিন্তু আদেশ পাওয়ার পর তার অন্তরের অহংকার প্রকাশ পায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

"সবাই সিজদা করল, কিন্তু ইবলিস করল না; সে অস্বীকার করল এবং অহংকার করল। ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।"
— সূরা আল-বাকারাহ : ৩৪

ইবলিস তার অবাধ্যতার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিল—

"আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা।"
— সূরা আল-আ'রাফ : ১২

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, অহংকার ও আত্মগর্ব ইবলিসকে সত্য গ্রহণ থেকে বিরত রেখেছিল। সে নিজের জ্ঞান ও মর্যাদাকে বড় মনে করে আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছিল।
কুরআনে আরও বলা হয়েছে—

“সে ছিল জিনদের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল..... ।”

— সূরা আল-কাহফ : ৫০

ইবলিসের এই অবাধ্যতা ছিল তার ধ্বংসের মূল কারণ। সে আল্লাহর নির্দেশের সামনে নিজের যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছিল। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, আল্লাহর আদেশের সামনে ব্যক্তিগত অহংকার ও যুক্তিকে বড় মনে করা অত্যন্ত ভয়ংকর।

এই ঘটনা আমাদের জন্য বড় শিক্ষা বহন করে। একজন মানুষ যত ইবাদতকারীই হোক না কেন, অহংকার তাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

৩.৪ অহংকারের পরিণতি:

ইবলিসের অহংকার ও অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে নিজের রহমত থেকে বিতাড়িত করেন। সে আল্লাহর নিকট অভিশপ্ত হয়ে যায় এবং কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের শত্রু হিসেবে নির্ধারিত হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“আল্লাহ বললেন, ‘তুমি এখান থেকে নেমে যাও। এখানে অহংকার করার কোনো অধিকার তোমার নেই। অতএব বের হয়ে যাও, নিশ্চয়ই তুমি লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত।’”

— সূরা আল-আ‘রাফ : ১৩

আরও বলেন—

“নিশ্চয়ই তোমার ওপর কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আমার লা‘নত বর্ষিত হবে।”

— সূরা সাদ : ৭৮

ইবলিস আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার পর মানুষকে বিভ্রান্ত করার অঙ্গীকার করে। সে বলে—

“আমি অবশ্যই তাদেরকে আপনার সরল পথে বসে বিভ্রান্ত করব।”
— সূরা আল-আ'রাফ : ১৬

অহংকার মানুষের অন্যতম বড় ধ্বংসাত্মক গুণ। এটি মানুষকে সত্য গ্রহণ থেকে বিরত রাখে এবং আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয় করে তোলে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

“**যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।**”
— সহিহ মুসলিম, হাদিস :

অধ্যায়-৪ : শয়তানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

৪.১: মানুষকে পথভ্রষ্ট করা:

শয়তানের প্রধান লক্ষ্য হলো মানুষকে আল্লাহর সরল পথ থেকে বিচ্যুত করা। মানুষ যেন আল্লাহর আনুগত্য ছেড়ে গুনাহ ও অন্যায়ের পথে চলে যায়, আল্লাহর কাছ থেকে দূরে চলে যায় সেজন্য শয়তান সবসময় নানা কৌশল অবলম্বন করে। আদম (আ.)-এর প্রতি সিজদা করতে অস্বীকার করার পর থেকেই ইবলিস মানুষের প্রকাশ্য শত্রুতে পরিণত হয়। অহংকার ও অবাধ্যতার কারণে আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর সে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সে মানুষকে বিভিন্নভাবে ধোঁকা দিয়ে সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে সরিয়ে দেবে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে ইবলিসের সেই ঘোষণার কথা উল্লেখ করেছেন—

“সে বলল, ‘আপনি যেহেতু আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তাই আমি অবশ্যই তাদের জন্য আপনার সরল পথে বসে থাকব। তারপর আমি তাদের সামনে, পেছনে, ডানে ও বামে থেকে তাদের কাছে আসব। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।’”
— সূরা আল-আ‘রাফ : ১৬–১৭

এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, শয়তান মানুষের প্রতিটি দিক থেকে আক্রমণ করে তাকে বিভ্রান্ত এবং ধোকা দেওয়ার করার চেষ্টা করে। *কখনো সে পাপকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে, কখনো দুনিয়ার মোহে মানুষকে ব্যস্ত রাখে, আবার কখনো আল্লাহর আদেশ পালনে অলসতা সৃষ্টি করে। কখনো আবার আল্লাহর রহমতে কে নিরাশ করার চেষ্টা করে* সে মানুষের মনে এমনভাবে কুমন্ত্রণা দেয় যে, মানুষ ধীরে ধীরে গুনাহের পথে অগ্রসর হয় অথচ অনেক সময় বুঝতেই পারে না যে সে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা আরও
বলেন—

“নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু। অতএব তোমরা তাকে শত্রুরূপেই গ্রহণ করো।”
— সূরা ফাতির : ৬

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মানুষকে সতর্ক করেছেন যেন তারা শয়তানের ধোঁকায় না পড়ে। কারণ শয়তান কখনো মানুষের কল্যাণ চায় না; এবং সে কখনো চায় না ইবাদত,আমল এবং আখলাকের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করুক। বরং সে সবসময় চায় মানুষ ঈমান হারিয়ে, গুনাহ করে জাহান্নামের পথে চলে যাক। তাই শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য সর্বদা সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

শয়তান মানুষের অন্তরে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করে এবং ধীরে ধীরে তাকে সত্য পথ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। প্রথমে সে ছোট গুনাহের দিকে আহ্বান করে, পরে বড় অন্যায়ের দিকে নিয়ে যায়.ছোট পাপকে তুচ্ছ মনে করিয়ে মানুষকে ধীরে ধীরে বড় গুনাহে অভ্যস্ত করে তোলে। এভাবে মানুষ একসময় আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।”
— সূরা আল-বাকারাহ : ১৬৮

শয়তানের পথভ্রষ্ট করার কৌশল অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও ধোঁকাপূর্ণ। সে মানুষকে এমনভাবে বিভ্রান্ত করে যে, অনেক সময় মানুষ ভুল পথকে সঠিক মনে করতে শুরু করে। কখনো অহংকার, কখনো হিংসা, কখনো লোভ ও নফসের কামনার মাধ্যমে মানুষকে গুনাহের দিকে ধাবিত করে। যেমন অহংকার ইবলিসকে ধ্বংস করেছিল, তেমনি সে মানুষের অন্তরেও অহংকার সৃষ্টি করতে চায়। আবার কখনো মানুষকে হতাশ করে তোলে এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হতে প্ররোচিত করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

“নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের শরীরে রক্তপ্রবাহের ন্যায় চলাচল করে।”
— *সহিহ বুখারি,*

এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, শয়তান সর্বদা মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেওয়ার সুযোগ খোঁজে। সে মানুষের দুর্বলতা, আবেগ ও প্রবৃত্তিকে ব্যবহার করে তাকে বিপথে পরিচালিত করতে চায়।

তবে একজন মুমিন যদি আল্লাহর স্মরণে অটল থাকে, তাহলে সে শয়তানের ধোঁকা থেকে রক্ষা পেতে পারে। নিয়মিত সালাত আদায়, কুরআন তিলাওয়াত, দোয়া ও ইস্তিগফার এবং সৎ সঙ্গ গ্রহণ মানুষের অন্তরকে শক্তিশালী করে। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ও তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনার মাধ্যমে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচা সম্ভব।

মানুষকে পথভ্রষ্ট করাই শয়তানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। সে বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে মানুষকে সত্য, ন্যায় ও আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়।

৪.২ ঈমানের দূর্বলতা:

শয়তানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানুষের ঈমান দুর্বল করে দেওয়া। কারণ ঈমান মানুষের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। একজন মানুষের অন্তরে যত বেশি ঈমান দৃঢ় থাকে, সে তত বেশি আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকে। তাই শয়তান সর্বদা চেষ্টা করে মানুষের অন্তরে সন্দেহ, গাফেলতি ও পাপের প্রবণতা সৃষ্টি করতে, যাতে তার ঈমান ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যায়।

শয়তান কখনো সরাসরি মানুষকে কুফরির দিকে আহ্বান করে না; বরং ধীরে ধীরে ঈমানের শক্তি নষ্ট করার চেষ্টা করে। প্রথমে সে মানুষের অন্তরে আল্লাহর আদেশ সম্পর্কে অলসতা সৃষ্টি করে, এরপর ইবাদতের প্রতি অনীহা তৈরি করে। একসময় মানুষ গুনাহে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং তার অন্তর কঠিন হয়ে যায়। তখন আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের চিন্তা তার হৃদয় থেকে কমে যেতে থাকে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন—

“শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়।”
— সূরা আল-বাকারাহ : ২৬৮

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, শয়তান মানুষের অন্তরে ভয় ও সন্দেহ সৃষ্টি করে। অনেক সময় মানুষ আল্লাহর উপর ভরসা না করে দুনিয়ার চিন্তায় বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন তার অন্তরে ঈমানের দুর্বলতা দেখা দেয়। শয়তান মানুষকে বোঝাতে চায় যে, আল্লাহর বিধান মানলে ক্ষতি হবে, দুনিয়াতে সফল হওয়া যাবে না। এভাবে সে মানুষকে ধীরে ধীরে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

ঈমান দুর্বল হওয়ার অন্যতম কারণ হলো গুনাহে লিপ্ত হওয়া। যখন মানুষ বারবার পাপ কাজ করে এবং তওবা করে না, তখন তার অন্তর অন্ধকার হয়ে যায়। শয়তান তখন তাকে আরও বেশি গুনাহের দিকে নিয়ে যায়। ছোট গুনাহকে তুচ্ছ মনে করিয়ে বড় পাপের দিকে ধাবিত করে। ফলে মানুষের হৃদয় থেকে ঈমানের আলো কমে যেতে থাকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

“বান্দা যখন গুনাহ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে।”
— সুনানে তিরমিজি

এই হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, গুনাহ মানুষের অন্তরকে দুর্বল করে দেয় এবং ঈমানের শক্তি কমিয়ে ফেলে। শয়তান চায় মানুষ গুনাহে লিপ্ত থাকুক, যাতে তার হৃদয় আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে চলে যায়।

বর্তমান সমাজে ঈমান দুর্বল হওয়ার অনেক কারণ দেখা যায়। অশ্লীলতা, মাদক, অসৎ সঙ্গ, ইসলামবিরোধী সংস্কৃতি এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অপব্যবহার মানুষের অন্তরকে গাফেল করে তুলছে। বিশেষ করে তরুণ সমাজ অনেক সময় দুনিয়ার

চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে আখিরাতের কথা ভুলে যাচ্ছে। শয়তান এসব মাধ্যম ব্যবহার করে মানুষের অন্তরে ঈমানের দুর্বলতা সৃষ্টি করছে।

তবে একজন মুমিন চাইলে নিজের ঈমানকে শক্তিশালী রাখতে পারে। নিয়মিত সালাত আদায়, কুরআন তিলাওয়াত, আল্লাহর জিকির, দোয়া ও সৎ সঙ্গ গ্রহণ ঈমান বৃদ্ধি করে। এছাড়া গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং দ্রুত তওবা করা ঈমানকে সুরক্ষিত রাখে। আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা ও আখিরাতের চিন্তা মানুষের অন্তরকে শক্তিশালী করে তোলে।

মানুষের ঈমান দুর্বল করাই শয়তানের অন্যতম বড় লক্ষ্য। সে বিভিন্নভাবে মানুষের অন্তরে সন্দেহ, ভয় ও গাফেলতি সৃষ্টি করে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত নিজের ঈমান রক্ষায় সচেষ্ট থাকা এবং সর্বদা আল্লাহর স্মরণে নিজেকে ব্যস্ত রাখা।

৪.৩ ইবাদত থেকে দূরে রাখা:

শয়তানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানুষকে ইবাদত থেকে দূরে রাখা। ইবাদত মানুষের সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্ককে দৃঢ় করে এবং মানুষের অন্তরকে পবিত্র রাখে। সালাত, রোজা, কুরআন তিলাওয়াত, জিকির ও দোয়ার মাধ্যমে একজন মুমিন আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে। তাই শয়তান সবসময় চেষ্টা করে যেন মানুষ ইবাদতের প্রতি অলস হয়ে পড়ে এবং ধীরে ধীরে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরে যায়।

শয়তান মানুষের মনে বিভিন্ন ধরনের কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে। কখনো সে মানুষকে দুনিয়ার কাজে অতিরিক্ত ব্যস্ত রাখে, কখনো অলসতা সৃষ্টি করে, আবার কখনো ইবাদতকে কঠিন মনে করায়। ফলে মানুষ ধীরে ধীরে ইবাদতের গুরুত্ব ভুলে যায়। বিশেষ করে সালাতের সময় শয়তান মানুষের মনে নানা চিন্তা এনে মনোযোগ নষ্ট করার চেষ্টা করে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন—

“আর শয়তান তাদের কার্যাবলি তাদের কাছে সুশোভিত করে দিয়েছিল এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে ফিরিয়ে রেখেছিল।”

— সূরা আন-নামল : ২৪

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, শয়তান মানুষকে এমনভাবে ধোঁকা দেয় যে, সে গুনাহ ও গাফেলতিকে স্বাভাবিক মনে করতে শুরু করে। ইবাদতের পরিবর্তে মানুষ দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও বিনোদনের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ে। এতে ধীরে ধীরে তার অন্তর কঠিন হয়ে যায় এবং আল্লাহর স্মরণ কমে যায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

“তোমাদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন শয়তান এসে তার মনে বিভিন্ন চিন্তা সৃষ্টি করে।”

— সহিহ বুখারি

এই হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, শয়তান বিশেষভাবে মানুষের ইবাদতে বাধা সৃষ্টি করতে চায়। সে চায় মানুষ যেন মনোযোগ সহকারে ইবাদত করতে না পারে। অনেক সময় মানুষ সালাত আদায়ে অলসতা অনুভব করে, কুরআন তিলাওয়াতে অনীহা দেখায় অথবা দোয়া ও জিকিরে অবহেলা করে। এগুলো শয়তানের প্রভাবেরই অংশ।

বর্তমান সমাজে মানুষ নানা ব্যস্ততার কারণে ইবাদত থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মোবাইল ফোন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, বিনোদন ও দুনিয়াবি প্রতিযোগিতা মানুষের সময় ও মনোযোগ কেড়ে নিচ্ছে। বিশেষ করে অনেক সময় রাত জেগে অপ্রয়োজনীয় কাজে সময় ব্যয় করা, কিন্তু ইবাদতের প্রতি গুরুত্ব দেয় না। শয়তান এসব মাধ্যম ব্যবহার করে মানুষকে গাফেল বানিয়ে রাখে।

তবে একজন মুমিন যদি সচেতন থাকে, তাহলে সে শয়তানের এই কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচতে পারে। সময়মতো সালাত আদায়, নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত, আল্লাহর জিকির

এবং সৎ মানুষের সঙ্গ গ্রহণ মানুষের অন্তরকে শক্তিশালী করে। এছাড়া ইবাদতের গুরুত্ব সম্পর্কে চিন্তা করা এবং আখিরাতের জবাবদিহিতার কথা স্মরণ রাখা মানুষকে আল্লাহর পথে অটল থাকতে সাহায্য করে।

মানুষকে ইবাদত থেকে দূরে রাখার মাধ্যমে শয়তান তাকে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত করতে চায়। কারণ ইবাদতই মানুষের ঈমানকে জীবিত রাখে এবং অন্তরকে আলোকিত করে। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচতে সর্বদা ইবাদতের প্রতি যত্নবান থাকা এবং আল্লাহর স্মরণে নিজেকে ব্যস্ত রাখা।

পাঠ–৪.৪ : গুনাহকে সুন্দর করে দেখানো:

শয়তানের অন্যতম ভয়ংকর ও ধূর্ত কৌশল হলো মানুষের সামনে গুনাহকে সুন্দর, সহজ এবং আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করা। মানুষ যদি গুনাহকে স্বাভাবিক বা আনন্দদায়ক মনে করে ফেলে, তাহলে সে খুব সহজেই পাপের পথে অগ্রসর হয়/হবে। এভাবেই শয়তান ধীরে ধীরে মানুষকে আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়, অথচ মানুষ অনেক সময় বুঝতেই পারে না যে সে ভুল পথে চলছে।

শয়তান প্রথমে মানুষের অন্তরে ছোট ছোট চিন্তা ও কুমন্ত্রণা ঢুকিয়ে দেয়। সে বলে— “এটা তো ছোট ব্যাপার”, “একবার করলে সমস্যা নেই”, “সবাই তো করছে, তুমি করলে কী হবে?”
আরেকটি ভয়ংকর কৌচল/কুমন্ত্রণা হলো
“তোমার রব তো দয়ালু” তোমার আল্লাহ তো ক্ষমাশীল”
এভাবে সে গুনাহকে তুচ্ছ করে দেখায়। যখন মানুষ ছোট গুনাহকে গুরুত্ব না দেয়, তখন ধীরে ধীরে সে বড় গুনাহের দিকে এগিয়ে যায়। এইভাবে শয়তান মানুষকে এক ধাপে এক ধাপে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন—

“আর শয়তান তাদের কাজকে তাদের কাছে সুন্দর করে দেখিয়েছে, ফলে সে তাদের সৎপথ থেকে ফিরিয়ে রেখেছে।”

— সূরা আন-নামল : ২৪

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, শয়তান মানুষের চোখে গুনাহকে এমনভাবে উপস্থাপন করে যে, তা আর খারাপ মনে হয় না বরং আকর্ষণীয় মনে হয়। যেমন মিথ্যা বলা, গীবত করা, সুদ গ্রহণ করা, অশ্লীলতা বা হারাম বিনোদন—এসবকে শয়তান ধীরে ধীরে মানুষের কাছে স্বাভাবিক বানিয়ে দেয়। ফলে মানুষ বিবেকের দংশন ছাড়া এগুলো করতে থাকে।

শয়তানের আরেকটি বড় কৌশল হলো “ধীরে ধীরে গুনাহে অভ্যস্ত করা”। সে মানুষকে একদিনে বড় পাপের দিকে নিয়ে যায় না। প্রথমে চোখের গুনাহ, তারপর কথার গুনাহ, এরপর ছোট ছোট হারাম কাজ—এভাবে অভ্যাস তৈরি করে। যখন মানুষ অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন সেই পাপ তার কাছে আর খারাপ লাগে না। তখন তাওবা করার অনুভূতিও কমে যায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

“তোমরা ছোট ছোট গুনাহকে হালকা মনে করা থেকে সাবধান হও।”

— সহিহ বুখারি ও মুসলিম

এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, ছোট গুনাহকেও অবহেলা করা বিপদের কারণ হতে পারে। কারণ ছোট গুনাহ একসময় বড় গুনাহে রূপ নেয় এবং অন্তরকে অন্ধকার করে দেয়। শয়তান এই সুযোগটাই নেয়—সে মানুষকে বোঝায় যে, “এটা তেমন কিছু না”, “পরে তওবা করে নেবো”—এই ধরনের চিন্তার মাধ্যমে সে মানুষকে গুনাহে ধরে রাখে।

বর্তমান সমাজে গুনাহকে সুন্দর করে দেখানোর অনেক মাধ্যম দেখা যায়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, সিনেমা, সিরিজ, গান, অশ্লীল কনটেন্ট—এসবের মাধ্যমে হারাম জিনিসকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা হয়। ফলে অনেক মানুষ বুঝতেই পারে না কোনটা ভালো আর কোনটা খারাপ। বিশেষ করে তরুণ সমাজ সহজেই এসবের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং ধীরে ধীরে পাপকে স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করে ফেলে।

শয়তান শুধু বাহ্যিক মাধ্যমেই নয়, মানুষের চিন্তাভাবনার মধ্যেও কাজ করে। সে মানুষের মনে অহংকার ঢুকিয়ে দেয়—"তুমি তো ভালো মানুষ, একটু করলে কিছু হবে না।" আবার কখনো আশার নামে ধোঁকা দেয়—"তুমি তো পরে তওবা করে নেবে।" এই দুই চিন্তা মানুষকে গুনাহে আটকে রাখে। ফলে সে বর্তমান পাপকে হালকা মনে করে এবং ভবিষ্যতের তওবার উপর ভরসা করে।

তবে একজন মুমিন যদি সচেতন থাকে, তাহলে সে শয়তানের এই ধোঁকা থেকে বাঁচতে পারে। প্রথমত, গুনাহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা জরুরি। দ্বিতীয়ত, আল্লাহর ভয় হৃদয়ে রাখা এবং আখিরাতের জবাবদিহিতার কথা স্মরণ করা,অন্ধকার কবরের কথা মনে করা প্রয়োজন। নিয়মিত ইবাদত, কুরআন তিলাওয়াত এবং সৎ মানুষের সঙ্গ গ্রহণ করলে গুনাহের প্রতি ঘৃণা তৈরি হয়। পাশাপাশি তওবার অভ্যাস গড়ে তুললে অন্তর পবিত্র থাকে।

গুনাহকে সুন্দর করে দেখানো শয়তানের অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও বিপজ্জনক কৌশল। এই কৌশলের মাধ্যমে সে মানুষকে ধীরে ধীরে আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত শয়তানের এই ধোঁকা সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং সর্বদা নিজের অন্তরকে গুনাহ থেকে রক্ষা করা।

৪.৫— ধীরে ধীরে গুনাহের দিকে নিয়ে যাওয়া:

শয়তানের একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও ধ্বংসাত্মক কৌশল হলো মানুষকে একসাথে বড় পাপে ফেলে দেওয়া নয়, বরং ধীরে ধীরে গুনাহের পথে নিয়ে যাওয়া। সে জানে, মানুষ

যদি হঠাৎ বড় পাপকে সরাসরি দেখতে পায়, তাহলে অনেক সময় ভয় পেয়ে সরে আসবে। তাই সে পরিকল্পিতভাবে ছোট ছোট ধাপের মাধ্যমে মানুষকে গুনাহের সাথে অভ্যস্ত করে তোলে, যতক্ষণ না সে পুরোপুরি সেই পাপে জড়িয়ে পড়ে।
প্রথমে শয়তান মানুষের অন্তরে সামান্য অবহেলা সৃষ্টি করে। যেমন—ইবাদতে অলসতা, সময়মতো সালাত আদায়ে দেরি করা, বা ছোট ছোট হারাম বিষয়কে গুরুত্ব না দেওয়া। এই ছোট অবহেলাগুলো যখন বারবার ঘটে, তখন তা অভ্যাসে পরিণত হয়। এরপর শয়তান সেই অভ্যাসকে আরও শক্তিশালী করে তোলে এবং মানুষকে বড় গুনাহের দিকে ধাবিত করে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন—

"তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।"
— সূরা আল-বাকারাহ : ১৬৮

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, শয়তান একসাথে মানুষকে বিপথে নেয় না; বরং ধাপে ধাপে নেয়। "পদাঙ্ক" শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, শয়তান এক একটি পদক্ষেপের মাধ্যমে মানুষকে ধীরে ধীরে গন্তব্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। যদি মানুষ প্রথম ধাপেই সতর্ক হয়ে যায়, তাহলে সে সহজেই রক্ষা পেতে পারে।
শয়তানের এই কৌশলের আরেকটি দিক হলো "স্বাভাবিকতা তৈরি করা"। সে মানুষকে বোঝায় যে, "সবাই তো করছে", "এটা এখন স্বাভাবিক", বা "এতে কী এমন ক্ষতি আছে?" এভাবে মানুষের বিবেক ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। যখন কোনো গুনাহ সমাজে স্বাভাবিক মনে হতে শুরু করে, তখন মানুষ আর তাকে গুনাহ হিসেবে দেখে না। এই অবস্থায় শয়তান তার লক্ষ্য অর্জনে আরও সহজ হয়ে যায়।
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অভ্যাস তৈরি করা। শয়তান মানুষকে একবার কোনো গুনাহে লিপ্ত করে, তারপর সেটিকে বারবার করতে উৎসাহিত করে। প্রথমে মানুষ অপরাধবোধ অনুভব করে, কিন্তু ধীরে ধীরে সেই অনুভূতি কমে যায়। একসময় সেই গুনাহ তার জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়ায়। তখন সে আর সহজে তা ছেড়ে দিতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

“যে ব্যক্তি গুনাহের উপর অব্যাহত থাকে, আল্লাহ তার অন্তরকে মোহর মেরে দেন।”
— (মর্মার্থ সহিহ হাদিস)

এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, বারবার গুনাহ করতে থাকলে মানুষের অন্তর কঠিন হয়ে যায় এবং সত্য গ্রহণের ক্ষমতা কমে যায়। শয়তান ঠিক এই অবস্থাটাই চায়—যাতে মানুষ ধীরে ধীরে আল্লাহর ভয় হারিয়ে ফেলে।
বর্তমান সমাজে এই কৌশলের প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখা যায়। অনেক মানুষ শুরু করে ছোট ছোট হারাম কাজ দিয়ে—অপ্রয়োজনীয় গাফেলতিতে সময় নষ্ট, অশ্লীল কনটেন্ট দেখা, মিথ্যা বলা বা ছোট অন্যায় করা। পরে এগুলোই বড় পাপের দিকে নিয়ে যায়। সামাজিক মাধ্যম, বন্ধুমহল এবং বিনোদনের মাধ্যমগুলো অনেক সময় এই ধীরে ধীরে গুনাহের পথে ঠেলে দেয়, যা মানুষ টেরও পায় না।

তবে একজন মুমিন যদি শুরুতেই সতর্ক থাকে, তাহলে এই ফাঁদ থেকে বাঁচা সম্ভব। প্রথম ধাপেই গুনাহকে চিহ্নিত করে তা থেকে ফিরে আসা জরুরি। তওবা করা, নিজের পরিবেশ পরিবর্তন করা এবং সৎ মানুষের সাথে থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি আল্লাহর জিকির এবং কুরআনের সাথে সম্পর্ক বাড়ালে অন্তর শক্তিশালী হয় এবং গুনাহের প্রতি আকর্ষণ কমে যায়।

ধীরে ধীরে গুনাহের দিকে নেওয়া শয়তানের অত্যন্ত ধূর্ত কৌশল। এই পথে সে মানুষকে এমনভাবে পরিচালিত করে যে, মানুষ নিজেই বুঝতে পারে না সে কখন আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরে গেছে। তাই আমাদের প্রত্যেক উচিত শুরু থেকেই ছোট গুনাহ থেকেও সাবধান থাকা এবং আল্লাহর নির্দেশিত পথে দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকা।

৫ম অধ্যায়: শয়তানের কৌশল ও প্রতারণা

৫.১ : ওয়াসওয়াসা

শয়তানের সবচেয়ে পরিচিত এবং বিপজ্জনক কৌশলগুলোর একটি হলো "ওয়াসওয়াসা" বা কুমন্ত্রণা। ওয়াসওয়াসা বলতে মানুষের অন্তরে খারাপ চিন্তা, সন্দেহ, ভয় বা গুনাহের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করাকে বোঝায়। শয়তান মানুষের হৃদয়ে বিভিন্ন ধরনের চিন্তা ঢুকিয়ে তাকে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়। এভাবেই সে ধীরে ধীরে মানুষকে গুনাহ ও পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়।
শয়তান সরাসরি মানুষকে বাধ্য করতে পারে না; বরং সে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। কখনো ইবাদতের সময় অপ্রয়োজনীয় চিন্তা এনে মনোযোগ নষ্ট করে, কখনো আল্লাহ সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করে, আবার কখনো গুনাহকে আকর্ষণীয় করে তোলে। মানুষের অন্তরে যখন এসব নেতিবাচক চিন্তা প্রবেশ করে, তখন ধীরে ধীরে তার ঈমান দুর্বল হতে থাকে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন—

"কুমন্ত্রণা দানকারীর অনিষ্ট থেকে, যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়।"
— সূরা আন-নাস : ৪–৫

এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, শয়তান মানুষের অন্তরে গোপনে কুমন্ত্রণা দেয়। সে এমনভাবে কাজ করে যে, অনেক সময় মানুষ বুঝতেই পারে না কোন চিন্তাটি তার নিজের আর কোনটি শয়তানের পক্ষ থেকে এসেছে। তাই ওয়াসওয়াসা থেকে বাঁচার জন্য সবসময় সচেতন থাকা প্রয়োজন।

ওয়াসওয়াসার মাধ্যমে শয়তান মানুষের অন্তরে ভয় ও সন্দেহ সৃষ্টি করে। যেমন— "তোমার ইবাদত কবুল হবে না", "তুমি ভালো হতে পারবে না", "আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন না"—এ ধরনের চিন্তা মানুষের মনকে দুর্বল করে দেয়। কখনো আবার

সে মানুষকে অহংকারে ফেলে দেয়, যাতে সে নিজেকে অন্যদের চেয়ে উত্তম মনে করে। আবার কখনো হতাশার মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

“শয়তান তোমাদের কারো কাছে এসে বলে, এটা কে সৃষ্টি করেছে? ওটা কে সৃষ্টি করেছে? অবশেষে বলে, তোমার রবকে কে সৃষ্টি করেছে?”
— সহিহ বুখারি

এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, শয়তান মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। বিশেষ করে ঈমান ও আকিদাহ সম্পর্কিত বিষয়ে কুমন্ত্রণা দিয়ে সে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায়। তাই এ ধরনের চিন্তা আসলে ভয় না পেয়ে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত।
বর্তমান সমাজে ওয়াসওয়াসার প্রভাব আরও বেশি দেখা যায়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, অশ্লীল কনটেন্ট, খারাপ পরিবেশ ও অসৎ সঙ্গ মানুষের মনে নানা ধরনের খারাপ চিন্তা সৃষ্টি করছে। শয়তান এসব মাধ্যম ব্যবহার করে মানুষের অন্তরকে দুর্বল করে দেয়।

তবে একজন মুমিন চাইলে ওয়াসওয়াসা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। আল্লাহর জিকির, নিয়মিত সালাত, কুরআন তিলাওয়াত এবং দোয়া মানুষের অন্তরকে শক্তিশালী করে। বিশেষ করে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করলে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে সুরক্ষা পাওয়া যায়। এছাড়া খারাপ চিন্তা আসলে সঙ্গে সঙ্গে “আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম” পড়া উত্তম।

ওয়াসওয়াসা হলো শয়তানের একটি গোপন কিন্তু অত্যন্ত কার্যকর অস্ত্র। এর মাধ্যমে সে মানুষের অন্তরকে দুর্বল করে এবং সত্য পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়। তাই প্রত্যেক মুসলমানেরt উচিত আল্লাহর স্মরণে নিজেকে ব্যস্ত রাখা এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য সর্বদা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা।

৫.২ মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি:

শয়তানের অন্যতম ভয়ংকর কৌশল হলো মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করা। সন্দেহ মানুষের ঈমানকে দুর্বল করে দেয় এবং সত্য পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। একজন মানুষ যখন আল্লাহ, ইসলাম, ইবাদত বা আখিরাত সম্পর্কে সন্দেহে পড়ে যায়, তখন তার অন্তর অস্থির হয়ে ওঠে। শয়তান এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে।

মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করার জন্য শয়তান বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে। কখনো সে আল্লাহর রহমত সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করে, কখনো ইবাদতের উপকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে, আবার কখনো ইসলামের বিধানকে কঠিন বা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করায়। ধীরে ধীরে এসব চিন্তা মানুষের ঈমানকে দুর্বল করে দেয়।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন—

"শয়তান তোমাদেরকে ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়।"

— সূরা আল-বাকারাহ : ২৬৮

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, শয়তান মানুষের অন্তরে ভয়, সন্দেহ ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে। সে মানুষকে বোঝাতে চায় যে, আল্লাহর বিধান মেনে চললে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ফলে মানুষ আল্লাহর উপর ভরসা কমিয়ে দুনিয়ার চিন্তায় বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে। শয়তানের সবচেয়ে বড় কৌশলগুলোর একটি হলো আকিদা ও ঈমান সম্পর্কে সন্দেহ তৈরি করা। সে মানুষের মনে এমন প্রশ্ন সৃষ্টি করে, যা তাকে বিভ্রান্ত করে তোলে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

"শয়তান তোমাদের কারো কাছে এসে বলে, এটা কে সৃষ্টি করেছে? ওটা কে সৃষ্টি করেছে? অবশেষে বলে, তোমার রবকে কে সৃষ্টি করেছে?"

— *সহিহ বুখারি*

এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, শয়তান মানুষের চিন্তার মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চায়। সে এমন সব কুমন্ত্রণা দেয়, যা মানুষের ঈমানকে দুর্বল করে। তাই এ ধরনের সন্দেহ মনে আসলে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং ঈমানকে দৃঢ় রাখা জরুরি।

শয়তান শুধু ধর্মীয় বিষয়েই নয়, মানুষের নিজের জীবন সম্পর্কেও সন্দেহ সৃষ্টি করে। যেমন—“তুমি ভালো হতে পারবে না”, “তোমার তওবা কবুল হবে না”, “আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন না”—এ ধরনের চিন্তার মাধ্যমে সে মানুষকে হতাশ করে তোলে। এতে মানুষ ধীরে ধীরে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যায়।
বর্তমান সমাজে সন্দেহ সৃষ্টি করার অনেক মাধ্যম রয়েছে। ইসলামবিরোধী প্রচারণা, বিভ্রান্তিকর তথ্য, খারাপ বন্ধু এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অপব্যবহার মানুষের মনে নানা প্রশ্ন ও দ্বিধা তৈরি করে। শয়তান এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তাদের ঈমান দুর্বল করার চেষ্টা করে।

একজন মুমিন যদি ইসলামের সঠিক জ্ঞান অর্জন করে, তাহলে সে এসব সন্দেহ থেকে বাঁচতে পারে। কুরআন ও হাদিস অধ্যয়ন, আলেমদের পরামর্শ গ্রহণ এবং আল্লাহর জিকির মানুষের অন্তরকে শক্তিশালী করে। এছাড়া দোয়া ও ইস্তিগফার মানুষের মনকে প্রশান্ত রাখে এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা দূর করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।”
— সূরা আর-রা‘দ : ২৮

মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করা শয়তানের একটি বড় কৌশল। এর মাধ্যমে সে মানুষের ঈমান দুর্বল করে এবং সত্য পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত সঠিক ইসলামি জ্ঞান অর্জন করা, আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচতে সর্বদা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা।

পাঠ–৩ : সময় নষ্ট ও গাফেল বানানো:

শয়তানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হলো মানুষকে সময় নষ্টে ব্যস্ত রাখা এবং তাকে গাফেল বা অসচেতন বানিয়ে দেওয়া। মানুষের জীবন অত্যন্ত মূল্যবান। প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নিয়ামত। এই সময়কে যদি সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায়, তাহলে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জন করতে পারে। কিন্তু শয়তান চায় মানুষ যেন তার মূল্যবান সময় অর্থহীন কাজে ব্যয় করে এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে থাকে।

সময় নষ্ট করার মাধ্যমে শয়তান ধীরে ধীরে মানুষের অন্তরকে গাফেল করে তোলে। প্রথমে মানুষ অপ্রয়োজনীয় কাজ, বিনোদন বা অলসতায় কিছু সময় ব্যয় করে। পরে সেটাই অভ্যাসে পরিণত হয়। একসময় সে ইবাদত, কুরআন তিলাওয়াত, জ্ঞান অর্জন ও ভালো কাজের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে। তখন তার হৃদয় আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরে যায় এবং গুনাহের পথ সহজ হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন—

“আর তারা দুনিয়ার জীবনে মগ্ন ছিল এবং আখিরাত সম্পর্কে ছিল গাফেল।”
— সূরা আর-রূম : ৭

এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, দুনিয়ার মোহে পড়ে মানুষ যখন আখিরাতকে ভুলে যায়, তখন সে গাফেল হয়ে পড়ে। শয়তান মানুষকে এমনসব কাজে ব্যস্ত রাখে, যাতে সে নিজের আসল উদ্দেশ্য ভুলে যায়। ফলে মানুষ সময়ের মূল্য বুঝতে পারে না এবং ধীরে ধীরে আল্লাহর পথ থেকে দূরে চলে যায়।

শয়তানের আরেকটি কৌশল হলো মানুষকে “পরে করব” চিন্তায় অভ্যস্ত করা। সে মানুষের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করে যে, “এখন আনন্দ করি, পরে ইবাদত করব”, “এখন বয়স কম, পরে ভালো হয়ে যাব”। এইভাবে মানুষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ পিছিয়ে দিতে দিতে একসময় গাফেল হয়ে পড়ে। অথচ মৃত্যু কখন আসবে তা কেউ জানে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

“দুটি নিয়ামত আছে, যেগুলোর ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত—সুস্থতা ও অবসর সময়।”
— সহিহ বুখারি

এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, অবসর সময় মানুষের জন্য একটি বড় নিয়ামত। কিন্তু অনেক মানুষ সেই সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার না করে অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করে। শয়তান এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে গাফেল বানিয়ে রাখে।

বর্তমান যুগে সময় নষ্টের মাধ্যম আরও বেড়ে গেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, অপ্রয়োজনীয় ভিডিও দেখা, অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহার, গেমস ও বিনোদনে আসক্তি মানুষের মূল্যবান সময় নষ্ট করছে। অনেক মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা এসব কাজে ব্যয় করলেও ইবাদত, পড়াশোনা বা আত্মশুদ্ধির জন্য সময় বের করতে পারে না। ধীরে ধীরে এসব অভ্যাস মানুষের অন্তরকে দুর্বল করে দেয়।
বিশেষ করে তরুণ সমাজ আজ সময় অপচয়ের বড় সংকটে ভুগছে। রাত জেগে অপ্রয়োজনীয় কাজ করা, ফজরের সালাত না পড়া, কুরআন তিলাওয়াতে অবহেলা করা এবং দায়িত্বহীন জীবনযাপন মানুষকে গাফেল করে তুলছে। শয়তান এসব কাজকে আনন্দদায়ক হিসেবে উপস্থাপন করে, যাতে মানুষ বাস্তব উদ্দেশ্য ভুলে যায়।

গাফেল হওয়ার সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো মানুষের অন্তর কঠিন হয়ে যায়। তখন আল্লাহর কথা শুনেও তার হৃদয়ে প্রভাব পড়ে না। ইবাদতে মন বসে না, গুনাহকে খারাপ মনে হয় না এবং আখিরাতের চিন্তাও কমে যায়। এই অবস্থায় মানুষ ধীরে ধীরে শয়তানের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

তবে একজন মুমিন যদি সচেতন থাকে, তাহলে সে সময়ের সঠিক ব্যবহার করতে পারে। প্রতিদিনের কাজ পরিকল্পনা করে করা, সময়মতো সালাত আদায়, কুরআন তিলাওয়াত, জ্ঞান অর্জন এবং উপকারী কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখা গাফেলতিকে দূর করে। পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয় কাজ ও খারাপ সঙ্গ পরিহার করা খুবই জরুরি।

আল্লাহ তাআলা সূরা আল-আসরে সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন—

“সময়-এর শপথ, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে এবং সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।”
— সূরা আল-আসর : ১–৩

এই আয়াতের মাধ্যমে বোঝা যায়, সময়ের সঠিক ব্যবহার না করলে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত নিজের সময়কে মূল্যবান মনে করা এবং তা আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে ব্যয় করা।

সময় নষ্ট ও গাফেল বানানো শয়তানের অত্যন্ত কার্যকর একটি কৌশল। এর মাধ্যমে সে মানুষকে ধীরে ধীরে আল্লাহর স্মরণ ও ইবাদত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত সময়ের মূল্য উপলব্ধি করা, গাফেলতা থেকে বেঁচে থাকা এবং প্রতিটি মুহূর্তকে কল্যাণকর কাজে ব্যবহার করা।

৫.৪ : মানুষকে হতাশ করা:

শয়তানের আরেকটি অন্যতম কৌশল হলো মানুষকে হতাশ করে তোলা। হতাশা মানুষের অন্তরকে দুর্বল করে দেয় এবং তাকে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। যখন মানুষ জীবনের বিভিন্ন সমস্যা, গুনাহ বা ব্যর্থতার কারণে নিরাশ হয়ে পড়ে, তখন শয়তান সেই সুযোগকে কাজে লাগায়। সে মানুষের মনে এমন চিন্তা সৃষ্টি করে যাতে মানুষ মনে করে—তার জন্য আর ক্ষমা নেই, তার জীবন অর্থহীন, অথবা সে কখনো ভালো হতে পারবে না।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সবসময় আশা ও রহমতের শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু শয়তান চায় মানুষ যেন আল্লাহর দয়া সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করে। সে মানুষের মনে এই চিন্তা ঢুকিয়ে দেয় যে, “তোমার এত গুনাহ হয়েছে যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন

না", "তুমি কখনো পরিবর্তন হতে পারবে না", বা "ইবাদত করে লাভ নেই"। এসব চিন্তার মাধ্যমে মানুষ ধীরে ধীরে আল্লাহর প্রতি আশা হারিয়ে ফেলে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন—

"তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব গুনাহ ক্ষমা করেন।"

— সূরা আয-যুমার : ৫৩

এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, আল্লাহর রহমত অত্যন্ত ব্যাপক। মানুষ যত বড় গুনাহই করুক না কেন, যদি সে আন্তরিকভাবে তওবা করে, তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু শয়তান চায় মানুষ যেন এই সত্য ভুলে যায় এবং হতাশার মধ্যে ডুবে থাকে।
হতাশা মানুষের ঈমানের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যখন কেউ মনে করে তার কোনো মূল্য নেই বা আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন না, তখন সে ইবাদত থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করে। সালাত, দোয়া, কুরআন তিলাওয়াত—সবকিছুর প্রতি তার আগ্রহ কমে যায়। ধীরে ধীরে সে গাফেল হয়ে পড়ে এবং গুনাহের মধ্যে ডুবে যায়। শয়তানের উদ্দেশ্যই হলো মানুষকে এমন অবস্থায় নিয়ে যাওয়া, যেখানে সে আল্লাহর দিকে ফিরে আসার আশা হারিয়ে ফেলে।

শয়তান শুধু গুনাহের কারণেই হতাশা সৃষ্টি করে না; বরং দুনিয়ার কষ্ট ও ব্যর্থতাকেও ব্যবহার করে। পরীক্ষায় ব্যর্থতা, অর্থনৈতিক সমস্যা, পারিবারিক অশান্তি বা মানুষের কষ্টদায়ক আচরণ—এসব বিষয় নিয়ে সে মানুষের মনে অতিরিক্ত ভয় ও দুশ্চিন্তা সৃষ্টি করে। ফলে মানুষ ধৈর্য হারিয়ে ফেলে এবং মনে করে তার জীবন অন্ধকারে ভরে গেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—
"মুমিনের অবস্থা আশ্চর্যজনক। তার প্রতিটি বিষয়ই কল্যাণকর।"

— সহিহ মুসলিম

এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, একজন প্রকৃত মুমিন কখনো সম্পূর্ণ হতাশ হয় না। সুখে সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে এবং দুঃখে ধৈর্য ধারণ করে। কিন্তু শয়তান চায় মানুষ যেন ধৈর্য হারিয়ে ফেলে এবং আল্লাহর সিদ্ধান্তের উপর অসন্তুষ্ট হয়।

বর্তমান সমাজে হতাশা একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অন্যের সুখী জীবন দেখে অনেক মানুষ নিজের জীবনকে ব্যর্থ মনে করে। আবার অনেকে আছেন ভবিষ্যৎ নিয়ে ভয় ও অনিশ্চয়তায় ভুগে হতাশ হয়ে পড়ে। শয়তান এসব অনুভূতিকে আরও বাড়িয়ে তোলে, যাতে মানুষ মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরে যায়।

একজন মুসলমানের উচিত সবসময় মনে রাখা যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাকে কখনো একা ছেড়ে দেন না।
আল্লাহ তাআলা বলেন—

“নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে রয়েছে স্বস্তি।”
— *সূরা আশ-শারহ : ৬*

এই আয়াত মানুষকে আশাবাদী হতে শিক্ষা দেয়। জীবনে যত কষ্টই আসুক না কেন, আল্লাহ অবশ্যই তার জন্য সহজ পথ তৈরি করেন। তাই হতাশ না হয়ে ধৈর্য ও তাওয়াক্কুলের সাথে আল্লাহর উপর নির্ভর করা উচিত।

মানুষকে হতাশ করা শয়তানের একটি বিপজ্জনক কৌশল। এর মাধ্যমে সে মানুষকে আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত সবসময় আল্লাহর উপর আশা রাখা, ধৈর্য ধারণ করা এবং কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া।

৬ষ্ঠ অধ্যায়: মানুষের জীবনে শয়তানের প্রভাব

৬.১ ঈমানের উপর প্রভাব

ঈমান হলো মানুষের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। একজন মুসলমানের চিন্তা, বিশ্বাস ও আমল ঈমানের উপর নির্ভর করে। কিন্তু শয়তান সবসময় মানুষের ঈমান নষ্ট ও দুর্বল করার চেষ্টা করে। সে বিভিন্ন কুমন্ত্রণা ও প্রতারণার মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। তাই একজন মুমিনের উচিত শয়তানের চক্রান্ত সম্পর্কে সচেতন থাকা।

শয়তান প্রথমে মানুষের অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করে। সে আল্লাহ, আখিরাত, ইবাদত ও ইসলামের বিধান সম্পর্কে মানুষের মনে প্রশ্ন ও দ্বিধা তৈরি করার চেষ্টা করে। যখন মানুষ আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে থাকে, তখন শয়তানের কুমন্ত্রণা সহজে তার অন্তরে প্রবেশ করে। ধীরে ধীরে এই সন্দেহ মানুষের ঈমানকে দুর্বল করে ফেলে। অনেক সময় মানুষ গুনাহকে ছোট মনে করতে শুরু করে এবং তাওবার গুরুত্ব ভুলে যায়। এভাবেই শয়তান ধীরে ধীরে মানুষের অন্তরকে কঠিন করে তোলে।

শয়তান মানুষের মধ্যে দুনিয়ার প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসাও সৃষ্টি করে। মানুষ যখন দুনিয়ার ভোগ-বিলাস, সম্পদ, খ্যাতি ও আনন্দে অতিরিক্ত মগ্ন হয়ে যায়, তখন আখিরাতের চিন্তা কমে যায়। ফলে ইবাদতের প্রতি আগ্রহ কমে যায় এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দুর্বল হতে থাকে। বর্তমান সমাজে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, অশ্লীলতা, খারাপ সঙ্গ ও গাফেলতির কারণে অনেক মানুষ দ্বীনের পথ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এসবের মাধ্যমে শয়তান মানুষের ঈমানের উপর গভীর প্রভাব ফেলে।

যখন মানুষ গুনাহ করতে করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন তার অন্তর কঠিন হয়ে পড়ে। সে ভালো কাজের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং খারাপ কাজকে স্বাভাবিক মনে করতে শুরু করে। শয়তান গুনাহকে মানুষের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

"শয়তান তাদের কর্মকে তাদের কাছে সুশোভিত করে দেখিয়েছে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে ফিরিয়ে রেখেছে।"
— সূরা আনকাবুত: ৩৮

ফলে একজন ব্যক্তি ধীরে ধীরে নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, দোয়া ও অন্যান্য ইবাদত থেকে দূরে সরে যায়। এর প্রভাব সরাসরি তার ঈমানের উপর পড়ে

এছাড়াও শয়তান মানুষকে হতাশ ও নিরাশ করার চেষ্টা করে। কোনো ব্যক্তি গুনাহ করলে শয়তান তাকে বোঝায় যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না। ফলে মানুষ তাওবা করা থেকে দূরে সরে যায়। অথচ আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত দয়ালু এবং তিনি বান্দার তাওবা কবুল করেন। শয়তানের এই প্রতারণা বুঝতে না পারলে একজন ব্যক্তি ধীরে ধীরে ঈমান হারানোর পথে চলে যেতে পারে।

ঈমান রক্ষা করার জন্য একজন মুসলমানকে নিয়মিত সালাত আদায়, কুরআন তিলাওয়াত, আল্লাহর জিকির এবং দোয়া করতে হবে। সৎ সঙ্গ গ্রহণ এবং খারাপ পরিবেশ থেকে দূরে থাকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যখন মানুষ আল্লাহর উপর ভরসা রাখে এবং তাঁর নির্দেশ মেনে চলে, তখন শয়তান তার উপর সহজে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত নিজের ঈমানকে শক্তিশালী করার জন্য সচেষ্ট থাকা এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা।

৬.২ – ইবাদতে অলসতা:

শয়তান মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু হিসেবে সবসময় তাকে আল্লাহর ইবাদত থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে। তার অন্যতম কৌশল হলো মানুষের মধ্যে অলসতা সৃষ্টি করা। যখন একজন মানুষ ইবাদতের প্রতি অনীহা অনুভব করে, তখন ধীরে ধীরে তার আমল

কমে যায় এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দুর্বল হতে থাকে। এভাবেই শয়তান মানুষকে দ্বীনের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়।

ইবাদতে অলসতা বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। অনেক সময় মানুষ নামাজ দেরিতে আদায় করে, কখনো নামাজ ছেড়ে দেয়, আবার কখনো কুরআন তিলাওয়াত বা দোয়া করতে অবহেলা করে। শয়তান মানুষের মনে এমন ধারণা সৃষ্টি করে যে, "এখন না, পরে করব" বা "আজকে না পড়লেও সমস্যা নেই।" ধীরে ধীরে এই গাফেলতি অভ্যাসে পরিণত হয় এবং ইবাদতের প্রতি আগ্রহ কমে যায়।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

"আর যখন তারা সালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসভাবে দাঁড়ায়।"
— সূরা আন-নিসা: ১৪২

বিশেষ করে ফজরের নামাজের ক্ষেত্রে শয়তান মানুষের উপর বেশি প্রভাব বিস্তার করে। মানুষ ঘুম ও অলসতার কারণে সময়মতো উঠতে চায় না। একইভাবে কুরআন তিলাওয়াত, যিকির ও নফল ইবাদতের ক্ষেত্রেও শয়তান বিভিন্ন অজুহাত সৃষ্টি করে। ফলে একজন ব্যক্তি দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত থাকলেও ইবাদতের জন্য সময় বের করতে পারে না।

বর্তমান সমাজে প্রযুক্তির অতিরিক্ত ব্যবহারও ইবাদতে অলসতার একটি বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক মানুষ দীর্ঘ সময় মোবাইল ফোন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও বিনোদনে কাটিয়ে দেয়, কিন্তু ইবাদতের সময় এলে ক্লান্তি অনুভব করে। শয়তান এসব কাজে মানুষকে এত বেশি ব্যস্ত রাখে যে, সে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে পড়ে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

"তোমরা আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো।"

— সূরা আহযাব: ৪১

ইবাদতে অলসতা দূর করার জন্য একজন মুসলমানকে আত্মসংযমী হতে হবে এবং নিয়মিত ইবাদতের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। সময়মতো সালাত আদায়, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির ও দোয়ার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারে। পাশাপাশি সৎ সঙ্গ গ্রহণ এবং অলসতা দূর করার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া প্রয়োজন। একজন ব্যক্তি যত বেশি আল্লাহর স্মরণে থাকবে, শয়তান তত কম তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে।

৬.৩– পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা:

শয়তান মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের পাশাপাশি পারিবারিক ও সামাজিক জীবনেও নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। তার অন্যতম লক্ষ্য হলো মানুষের মাঝে বিভেদ, হিংসা, ঝগড়া ও অশান্তি সৃষ্টি করা। একটি পরিবার সমাজের মূল ভিত্তি। পরিবারে শান্তি নষ্ট হলে সমাজেও অস্থিরতা দেখা দেয়। তাই শয়তান সবসময় চেষ্টা করে মানুষকে একে অপরের বিরুদ্ধে উসকানি দিতে এবং সম্পর্কের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করতে।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

“শয়তান তো তাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায়।”
— সূরা আল-মায়িদাহ: ৯১

পরিবারে ছোট ছোট বিষয় নিয়ে ঝগড়া, রাগ, অহংকার ও ভুল বোঝাবুঝির পেছনে অনেক সময় শয়তানের কুমন্ত্রণা কাজ করে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করা শয়তানের একটি বড় কৌশল। যখন পরিবারের সদস্যরা আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরে যায়, তখন পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্মান কমে যেতে থাকে। ফলে পরিবারে কলহ, অশান্তি ও সম্পর্কের অবনতি দেখা দেয়।

শয়তান শুধু পরিবারেই নয়, সমাজের মধ্যেও নানা সমস্যা সৃষ্টি করে। মানুষের মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ, গীবত, অপবাদ ও অন্যায় কাজ ছড়িয়ে দিয়ে সে সামাজিক শান্তি নষ্ট করে। বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপব্যবহার, মিথ্যা প্রচার, অশ্লীলতা ও খারাপ সংস্কৃতির প্রসারের মাধ্যমেও সমাজে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক মানুষ সামান্য বিষয় নিয়ে একে অপরের সাথে শত্রুতায় জড়িয়ে পড়ছে, যা সমাজের জন্য ক্ষতিকর।

খারাপ সঙ্গও সামাজিক অবক্ষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। শয়তান মানুষকে এমন বন্ধু ও পরিবেশের দিকে আকৃষ্ট করে, যা তাকে গুনাহের পথে নিয়ে যায়। এর ফলে তরুণ সমাজ নেশা, অশ্লীলতা, অসততা ও বিভিন্ন অপরাধের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ধীরে ধীরে সমাজে নৈতিকতা ও ইসলামী মূল্যবোধ কমে যেতে থাকে।

পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা থেকে বাঁচার জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করা অত্যন্ত জরুরি। পরিবারে আল্লাহর স্মরণ, সালাত, কুরআন তিলাওয়াত এবং পারস্পরিক ভালোবাসা বজায় রাখতে হবে। পাশাপাশি সমাজে সত্যবাদিতা, সহানুভূতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তুলতে হবে। একজন মুসলমান যদি ইসলামের নির্দেশনা মেনে চলে, তাহলে শয়তান সহজে তার পরিবার ও সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করতে পারবে না।

৬.৪– অন্তরের কঠিনতা ও গাফেলতি

মানুষের অন্তর (ক্বলব) হলো ঈমানের কেন্দ্রস্থল। অন্তর ঠিক থাকলে পুরো জীবন ঠিক থাকে, আর অন্তর নষ্ট হলে পুরো জীবনই বিপথে চলে যায়। শয়তানের একটি বড় কৌশল হলো মানুষের অন্তরকে ধীরে ধীরে কঠিন করে দেওয়া এবং তাকে গাফেল (অসচেতন) বানিয়ে ফেলা।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

"যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণ থেকে কঠিন হয়ে গেছে তাদের জন্য ধ্বংস।"

— সূরা আয-যুমার: ২২

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

“জেনে রাখো! শরীরের মধ্যে একটি মাংসপিণ্ড আছে, তা ঠিক থাকলে পুরো শরীর ঠিক থাকে। আর তা নষ্ট হলে পুরো শরীর নষ্ট হয়ে যায়। জেনে রাখো, সেটি হলো অন্তর।”
— *সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম*

এই হাদিসটি স্পষ্টভাবে বোঝায় যে মানুষের পুরো জীবনের ভালো-মন্দ নির্ভর করে তার অন্তরের উপর। শয়তান তাই প্রথমে অন্তরকে নষ্ট করার চেষ্টা করে।

শয়তান প্রথমে মানুষের মনে ছোট ছোট গাফেলতি সৃষ্টি করে। মানুষ ধীরে ধীরে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরে যায়, ইবাদতে অনীহা আসে, এবং গুনাহকে আর বড় কিছু মনে হয় না। এভাবেই অন্তর কঠিন হয়ে যায়।
যখন অন্তর কঠিন হয়ে যায়, তখন মানুষ নসিহত গ্রহণ করতে পারে না। ভালো কথা শুনলেও তার হৃদয়ে কোনো প্রভাব পড়ে না। সে নামাজ, কুরআন, দোয়া—এসবের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এমনকি গুনাহ করেও তার মনে আর অনুতাপ থাকে না।

বর্তমান সমাজে এই অবস্থাটা খুব বেশি দেখা যায়। মানুষ দুনিয়ার ব্যস্ততা, মোবাইল, সোশ্যাল মিডিয়া ও বিনোদনে এত বেশি ডুবে গেছে যে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে এই গাফেলতি অন্তরকে কঠিন করে দিচ্ছে।

অন্তরকে নরম ও জীবিত রাখার উপায় হলো আল্লাহর যিকির, কুরআন তিলাওয়াত এবং তাওবা করা।

যিকির:

আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন –

নিশ্চয়ই শয়তান তার শুঁড় মানবজাতির হৃদয়ের উপর রাখে। যখন সে আল্লাহর জিকির করে, তখন সে (তার শুঁড়ট) দূরে সরিয়ে নেয়।আর যদি আল্লাহকে ভুলে যায় তাহলে পূর্ণ অন্তরকে গ্রাস করে ফেলে।

শয়তানের চক্রান্ত পৃ:৪৮

কুরআন তিলাওয়াত :

ইবনু লাহিয়া থেকে বর্ণিত, কায়েস বিন হাজ্জাজ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

'আমার মাঝে বসবাসকারী শয়তান একদিন আমাকে বলল, 'আমি তোমার মাঝে ঢোকার সময় বিস্তৃত শিকড়ের মতো ছিলাম। আজ আমি তোমার মাঝে চড়ুই পাখির মতো হয়ে গেছি।

তিনি বললেন, 'কেন এমন হলো? '
শয়তান বলল, 'তুমি আমাকে কুরআন পাঠের মাধ্যমে গুলিয়ে ফেলেছ'।

একজন মুমিন যদি নিয়মিত নিজের অন্তরকে চেক করে এবং আল্লাহর স্মরণে থাকে, তাহলে শয়তান তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।
তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত অন্তরকে গাফেলতি থেকে রক্ষা করা এবং আল্লাহর স্মরণে সবসময় জীবিত রাখা।

৭ম অধ্যায়: শয়তান ও নফসের সম্পর্ক

৭. ১: নফসের পরিচয়:

মানুষের ভেতরে যে অন্তর্নিহিত ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, প্রবৃত্তি এবং অনুভূতির সমষ্টি কাজ করে—তাকেই ইসলামী পরিভাষায় নফস বলা হয়। নফস মানুষের ভালো-মন্দ উভয় দিকেই প্রভাব ফেলে। এটি একদিকে মানুষকে নেক কাজ, ইবাদত ও কল্যাণের দিকে নিয়ে যেতে পারে, আবার অন্যদিকে গুনাহ, অবাধ্যতা ও প্রবৃত্তির অনুসরণের দিকেও ঠেলে দিতে পারে।
নফসের প্রকৃতি।

নফস নিজে নিরপেক্ষ নয়; এটি মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকলে কল্যাণের মাধ্যম হয়, আর নিয়ন্ত্রণ হারালে ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই নফসকে ইসলামে একটি বড় পরীক্ষা হিসেবে দেখা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“নিশ্চয়ই নফস মানুষকে মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়...” (সূরা ইউসুফ: ৫৩)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, নফস স্বাভাবিকভাবেই মানুষকে প্রবৃত্তির দিকে টানে, বিশেষ করে যখন মানুষ আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে থাকে।

নফসের স্তরসমূহ
ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নফসের কয়েকটি স্তর রয়েছে—

নফসে আম্মারা (প্রবৃত্তির নির্দেশক নফস)
এটি সেই নফস যা মানুষকে গুনাহ, লোভ, কামনা-বাসনা ও অন্যায় কাজের দিকে আহ্বান করে।

নফসে লাওয়ামা (আত্মভর্ৎসনাকারী নফস)

এই নফস ভুল করলে অনুতপ্ত হয় এবং নিজেকে তিরস্কার করে। এটি ভালো-মন্দের মাঝে সংগ্রামরত অবস্থায় থাকে।

নফসে মুতমাইন্না (প্রশান্ত নফস)

এটি সেই পরিশুদ্ধ নফস যা আল্লাহর আনুগত্যে শান্তি খুঁজে পায়। ইবাদত ও আল্লাহর স্মরণে এটি স্থির থাকে।

নফস কেন গুরুত্বপূর্ণ?

নফস বোঝা একজন মুমিনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শয়তান সরাসরি মানুষের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে না; সে নফসের দুর্বলতাকে কাজে লাগায়। যখন নফস দুর্বল হয়, তখন শয়তান তাকে প্রভাবিত করে গুনাহের দিকে নিয়ে যায়।

তাই যে ব্যক্তি নিজের নফসকে চেনে না, সে সহজেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

নফস নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা

ইসলাম নফস দমন করতে বলে না, বরং তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে শেখায়।

যেমন—

আল্লাহর ভয় অন্তরে রাখা

নিয়মিত ইবাদত করা

গুনাহ থেকে দূরে থাকা

আত্মসমালোচনা করা

ধৈর্য ও সংযম অনুশীলন করা

নফস মানুষের ভেতরের এক শক্তিশালী বাস্তবতা, যা তাকে উন্নতির শিখরে নিতে পারে আবার পতনের গহ্বরে ফেলতেও পারে। তাই একজন মুমিনের দায়িত্ব হলো নিজের নফসকে চিনে তা আল্লাহর নির্দেশনার অধীনে রাখা, যাতে শয়তান তার দুর্বলতা কাজে লাগাতে না পারে।

৭.২ – শয়তান নফসকে ব্যবহার করে:

মানুষের অন্তরে যে নফস বিদ্যমান, সেটি মূলত একটি শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ প্রেরণা। এই নফস যদি নিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহলে সেটিই শয়তানের জন্য সবচেয়ে সহজ প্রবেশদ্বার হয়ে যায়। শয়তান মানুষের ওপর সরাসরি ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না; বরং সে মানুষের নফসের দুর্বল দিকগুলোকে কাজে লাগিয়ে তাকে বিভ্রান্ত করে।

শয়তানের কৌশল: নফসকে টার্গেট করা

শয়তান খুব সূক্ষ্মভাবে মানুষের নফসকে বুঝে নেয়। প্রতিটি মানুষের দুর্বলতা একরকম নয়। কারও মধ্যে লোভ বেশি, কারও মধ্যে রাগ, আবার কারও মধ্যে কামনা-বাসনা প্রবল। শয়তান ঠিক এই দুর্বলতাগুলোকে কেন্দ্র করেই কাজ করে।

যখন নফস কোনো পাপের প্রতি আগ্রহ দেখায়, তখন শয়তান সেটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। সে গুনাহকে সুন্দর, সহজ এবং "ক্ষতিকর নয়" হিসেবে উপস্থাপন করে। ফলে মানুষ ধীরে ধীরে সেই পথে এগিয়ে যায়।

নফস ও শয়তানের পারস্পরিক সম্পর্ক

নফস এবং শয়তান একে অপরের সহযোগী নয়, কিন্তু বাস্তবে তারা মানুষের ধ্বংসের ক্ষেত্রে একসাথে কাজ করে। নফস হলো ভিতরের আকাঙ্ক্ষা, আর শয়তান হলো বাহ্যিক প্ররোচনাকারী শক্তি।

নফস চায় ভোগ ও আনন্দ

শয়তান সেই চাওয়াকে আরও শক্তিশালী করে

ফলে মানুষ নিয়ন্ত্রণ হারায়

এইভাবে শয়তান মানুষের নিজের ভেতরের ইচ্ছাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে।

ওয়াসওয়াসার মাধ্যমে প্রভাব শয়তানের প্রধান হাতিয়ার হলো ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রণা)। সে মানুষের মনে ধীরে ধীরে চিন্তা ঢুকিয়ে দেয়—

"এটা করলে তো কোনো সমস্যা নেই"

"আরেকবার করলে কী হবে?"

"সবাই তো করছে"
এই ধরনের চিন্তা প্রথমে ছোট মনে হলেও ধীরে ধীরে তা বড় গুনাহে রূপ নেয়। এখানে নফস যদি দুর্বল হয়, তাহলে সে সহজেই এই ওয়াসওয়াসা গ্রহণ করে নেয়।

একজন মানুষ যখন কোনো গুনাহ করার চিন্তা করে, তখন প্রথমে তার নফস সেই কাজকে "চাওয়া" হিসেবে উপস্থাপন করে। এরপর শয়তান সেই চাওয়াকে আরও শক্তিশালী করে "সঠিক সিদ্ধান্ত" হিসেবে দেখায়। ফলে ব্যক্তি ধীরে ধীরে কাজটি করে ফেলে।
এটি অনেকটা এমন—নফস দরজা খুলে দেয়, আর শয়তান ভিতরে প্রবেশ করে।
কুরআনের ইঙ্গিত

আল্লাহ তাআলা বলেন—

"নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু, তাই তোমরা তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ করো..."
(সূরা ফাতির: ৬)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, শয়তান সবসময় সক্রিয়ভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে এবং সে মানুষের দুর্বল দিকগুলো ব্যবহার করে।

৭.৩– নফস ও শয়তান একসাথে কাজ করে:

মানুষের পথভ্রষ্টতার পেছনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি কাজ করে—একটি হলো তার নফস, আর অন্যটি হলো শয়তানের প্ররোচনা। এ দুটি শক্তি আলাদা হলেও মানুষের জীবনে গুনাহের দিকে ধাবিত করার ক্ষেত্রে একে অপরের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিতভাবে কাজ করে। নফস মানুষের ভেতরের প্রবৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষাকে তৈরি করে, আর শয়তান সেই প্রবৃত্তিকে ব্যবহার করে তাকে আরও শক্তিশালী করে তোলে।

প্রথমত, নফস মানুষের ভেতরে বিভিন্ন ধরনের ইচ্ছা সৃষ্টি করে। এই ইচ্ছা কখনো বৈধ সীমার মধ্যে থাকে, আবার কখনো তা অবৈধ ও গুনাহের দিকে ঝুঁকে পড়ে। যখন নফস দুর্বল হয় এবং প্রবৃত্তির দিকে বেশি ঝোঁকে, তখন সে শয়তানের প্রভাব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

এ পর্যায়ে শয়তান মানুষের নফসের অবস্থাকে পর্যবেক্ষণ করে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করে। শয়তান মানুষের মনে ধীরে ধীরে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করে, যেমন—গুনাহকে সহজ, আকর্ষণীয় এবং ক্ষতিহীন হিসেবে উপস্থাপন করা। ফলে নফস যে কাজটি শুধু "চাইছিল", শয়তান সেটিকে "করা উচিত" পর্যায়ে নিয়ে যায়।

এইভাবে নফস ও শয়তানের মধ্যে একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া তৈরি হয়। প্রথমে নফস আকাঙ্ক্ষা তৈরি করে, এরপর শয়তান সেই আকাঙ্ক্ষাকে প্ররোচনায় পরিণত করে, এবং শেষ পর্যন্ত মানুষ সেই কাজ বাস্তবায়ন করে ফেলে। এই তিন ধাপের সমন্বয়েই মানুষ গুনাহের দিকে ধাবিত হয়।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একজন মানুষ যখন কোনো অন্যায় কাজ করার কথা ভাবে, তখন তার নফস সেই কাজের প্রতি আগ্রহ তৈরি করে। এরপর শয়তান এসে সেই চিন্তাকে আরও দৃঢ় করে তোলে—"এটা করলে কোনো সমস্যা নেই" বা "এটা তো স্বাভাবিক বিষয়"। ফলে ব্যক্তি ধীরে ধীরে সেই গুনাহে লিপ্ত হয়। এখানে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, নফস শুরু করে এবং শয়তান তাকে পূর্ণতা দেয়।
কুরআনে আল্লাহ তাআলা মানুষের এই অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শত্রুর বিষয়ে সতর্ক করেছেন। শয়তানকে প্রকাশ্য শত্রু হিসেবে উল্লেখ করে তাকে অনুসরণ না করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই সতর্কবার্তা প্রমাণ করে যে, শয়তান মানুষের ভেতরের দুর্বলতাকে ব্যবহার করে তাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়।
সুতরাং, নফস ও শয়তান একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে মানুষের বিরুদ্ধে কাজ করে—একটি অভ্যন্তরীণ প্রেরণা হিসেবে, আর অন্যটি বাহ্যিক প্ররোচক হিসেবে। এই সমন্বিত প্রভাবের ফলেই মানুষ ধীরে ধীরে গুনাহ ও গাফেলতির দিকে অগ্রসর হয়। তাই একজন মুমিনের জন্য প্রয়োজন হলো নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং শয়তানের

ওয়াসওয়াসা থেকে সতর্ক থাকা, যাতে এই দুই শক্তির প্রভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায়।

৭.৪– নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে আত্মসংযমের প্রয়োজন

মানুষের জীবনে নফস ও শয়তানের প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকার অন্যতম প্রধান মাধ্যম হলো আত্মসংযম (self-control)। আত্মসংযম বলতে বোঝায় নিজের প্রবৃত্তি, ইচ্ছা ও আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে আল্লাহর নির্দেশনার অধীনে পরিচালিত হওয়া। একজন মুমিন যত বেশি আত্মসংযমী হবে, তত বেশি সে শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও নফসের প্রবৃত্তিগত চাপ থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নফস মানুষকে বারবার গুনাহের দিকে আহ্বান করে, আর শয়তান সেই আহ্বানকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। এই অবস্থায় আত্মসংযম হলো সেই ঢাল, যা মানুষকে এই দুই শক্তির প্রভাব থেকে রক্ষা করে। আত্মসংযম ছাড়া মানুষ সহজেই আবেগ, রাগ, লোভ বা কামনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে, যার ফলে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

আত্মসংযমের প্রথম ধাপ হলো নিজের নফসকে চেনা এবং তার দুর্বলতাগুলো সম্পর্কে সচেতন থাকা। যে ব্যক্তি নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে জানে, সে সহজেই শয়তানের কৌশল বুঝতে পারে এবং তার থেকে দূরে থাকতে পারে। কারণ শয়তান সবসময় মানুষের দুর্বল দিকগুলোকে টার্গেট করে।

দ্বিতীয় ধাপ হলো তাকওয়া অর্জন করা। তাকওয়া মানুষের অন্তরে আল্লাহভীতি সৃষ্টি করে, যা তাকে গুনাহ থেকে দূরে রাখে। যখন মানুষের হৃদয়ে আল্লাহর ভয় জাগ্রত থাকে, তখন নফসের প্রবৃত্তি এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা তার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে না।

তৃতীয় ধাপ হলো নিয়মিত ইবাদত ও আত্মশুদ্ধি। সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, দোয়া ও ইস্তিগফার মানুষের অন্তরকে শক্তিশালী করে এবং নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। ইবাদতের মাধ্যমে মানুষ তার আত্মাকে প্রশিক্ষণ দেয়, ফলে সে সহজে শয়তানের ফাঁদে পড়ে না।

চতুর্থ ধাপ হলো ধৈর্য ও সংযম অনুশীলন করা। জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা আত্মসংযমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রাগ, লোভ বা আবেগের সময় নিজেকে সংযত রাখতে পারা একজন মুমিনের বিশেষ গুণ।

এইভাবে আত্মসংযম মানুষের জীবনে একটি প্রতিরক্ষামূলক শক্তি হিসেবে কাজ করে। এটি নফসের অতিরিক্ত চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করে এবং শয়তানের ওয়াসওয়াসাকে প্রত্যাখ্যান করতে সাহায্য করে। ফলে মানুষ ধীরে ধীরে পাপ থেকে দূরে সরে এসে আল্লাহর নৈকট্যের দিকে অগ্রসর হয়।

সুতরাং, নফস ও শয়তানের প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য আত্মসংযম অপরিহার্য। যে ব্যক্তি নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং আত্মসংযমের পথে অটল থাকে, সে শয়তানের বড় বড় প্ররোচনা থেকেও নিরাপদ থাকতে সক্ষম হয়।

৮ম অধ্যায়: শয়তান থেকে বাঁচার উপায়:

৮.১– আল্লাহর স্মরণ (যিকির)

মানুষের জীবনে শয়তানের প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী মাধ্যম হলো আল্লাহর স্মরণ বা যিকির। যিকির শুধু একটি সাধারণ ইবাদত নয়; বরং এটি একজন মুমিনের অন্তরকে জীবিত রাখার, ঈমানকে শক্তিশালী করার এবং নফস ও শয়তানের প্রভাব থেকে আত্মাকে সুরক্ষিত রাখার একটি মৌলিক আত্মিক অনুশীলন। ইসলামী দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী, মানুষের অন্তর যখন আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে থাকে, তখন সেই অন্তরে শয়তানের ওয়াসওয়াসা প্রবেশ করা সহজ হয়ে যায়। কারণ গাফেল অন্তর হলো শয়তানের সবচেয়ে সহজ লক্ষ্য।

অন্যদিকে, যখন মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন তার অন্তরে আল্লাহভীতি (তাকওয়া) সৃষ্টি হয় এবং শয়তানের প্রভাব ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যায়। এই কারণে যিকিরকে ইসলামে অন্তরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করা হয়।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন—

"নিশ্চয়ই আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।" (সূরা রা'দ: ২৮)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, যিকির মানুষের অন্তরে শান্তি, স্থিরতা এবং আত্মিক শক্তি সৃষ্টি করে। যখন অন্তর প্রশান্ত থাকে, তখন নফসের অস্থিরতা কমে যায় এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা কার্যকরভাবে প্রভাব ফেলতে পারে না।
যিকির মানুষের অন্তর ও আল্লাহর মধ্যে সম্পর্ককে দৃঢ় করে। এই সম্পর্ক যত গভীর হয়, ততই মানুষ তার কাজকর্মে সচেতন হয় এবং গুনাহ থেকে দূরে থাকার মানসিক শক্তি অর্জন করে। আল্লাহর স্মরণ মানুষকে সবসময় মনে করিয়ে দেয় যে সে আল্লাহর সামনে জবাবদিহির মধ্যে আছে। এই অনুভূতি তাকে ভুল পথে যাওয়া থেকে বিরত রাখে।

শয়তান মূলত সেই অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে যেখানে গাফেলতি, উদাসীনতা এবং আল্লাহভীতির অভাব থাকে। যিকির এই গাফেলতিকে দূর করে দেয় এবং অন্তরকে আলোকিত করে তোলে। ফলে শয়তানের জন্য সেই অন্তরে প্রবেশ করা কঠিন হয়ে যায়। এভাবে যিকির একটি আত্মিক ঢাল হিসেবে কাজ করে।

যিকিরের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এটি মানুষের চিন্তা ও মানসিক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। যখন মানুষ নিয়মিত আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন তার চিন্তাভাবনা ইতিবাচক ও পরিশুদ্ধ হয়। ফলে সে সহজে রাগ, লোভ, কামনা বা আবেগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। এটি নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

যিকির শুধু মুখের উচ্চারণ নয়; বরং অন্তরের গভীর উপলব্ধির সাথে আল্লাহকে স্মরণ করা। এই স্মরণ মানুষের জীবনের প্রতিটি কাজে সচেতনতা সৃষ্টি করে। ফলে সে বুঝতে পারে কোন কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির, আর কোন কাজ শয়তানের প্ররোচনার অংশ।

সুতরাং, আল্লাহর স্মরণ হলো একজন মুমিনের জন্য এমন এক শক্তিশালী আত্মিক অস্ত্র, যা তাকে শয়তানের কুমন্ত্রণা, নফসের দুর্বলতা এবং গাফেলতির অন্ধকার থেকে রক্ষা করে। যে ব্যক্তি নিয়মিত ও আন্তরিকভাবে যিকির করে, সে ধীরে ধীরে অন্তরের দৃঢ়তা অর্জন করে এবং শয়তানের প্রভাব থেকে নিরাপদ জীবন গঠন করতে সক্ষম হয়।

৮. ২– সালাত ও কুরআন তিলাওয়াত:

মানুষের জীবনে শয়তানের প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকার জন্য ইসলামে যেসব মৌলিক ইবাদতের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে সালাত (নামাজ) ও কুরআন তিলাওয়াত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এই দুটি ইবাদত শুধু আনুষ্ঠানিক উপাসনা নয়; বরং এগুলো একজন মুমিনের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে, নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে রক্ষা করে।

প্রথমত, সালাত হলো ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ এবং এটি একজন মুমিনের দৈনন্দিন জীবনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত একটি ইবাদত। দিনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মানুষকে নিয়মিতভাবে আল্লাহর সামনে দাঁড় করায়, যা তার অন্তরে জবাবদিহির অনুভূতি সৃষ্টি করে। এই অনুভূতি মানুষের ভেতরের গাফেলতি দূর করে এবং তাকে পাপ থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে। যখন মানুষ নিয়মিত সালাতে মনোযোগী থাকে, তখন তার হৃদয় আল্লাহর স্মরণে পরিপূর্ণ থাকে, ফলে শয়তানের প্রভাব সেখানে প্রবেশ করতে পারে না।

সালাত মানুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপনে অভ্যস্ত করে। নির্দিষ্ট সময়, নির্দিষ্ট নিয়ম ও নির্দিষ্ট অবস্থায় আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো মানুষের ভেতরের বিশৃঙ্খলতা দূর করে। এই শৃঙ্খলা নফসের অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে মানুষ ধীরে ধীরে আত্মনিয়ন্ত্রণের অভ্যাস গড়ে তোলে, যা শয়তানের কুমন্ত্রণা প্রতিরোধে কার্যকর।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন—

"নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।" (সূরা আনকাবুত: ৪৫)

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, সালাত শুধু একটি ইবাদত নয়; বরং এটি মানুষের চরিত্র সংশোধনকারী একটি শক্তিশালী মাধ্যম। যে সালাত সঠিকভাবে আদায় করা হয়, তা মানুষকে গুনাহ ও অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখে।

দ্বিতীয়ত, কুরআন তিলাওয়াত হলো মুমিনের আত্মার খাদ্য। কুরআন আল্লাহর কালাম, যা মানুষের অন্তরকে হেদায়েতের আলোয় আলোকিত করে। নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত মানুষের চিন্তা-চেতনাকে পরিশুদ্ধ করে এবং শয়তানের বিভ্রান্তিকর চিন্তাগুলো দূর করে দেয়। কারণ কুরআনের আলো যেখানে প্রবেশ করে, সেখানে অন্ধকার (শয়তানের প্রভাব) স্থায়ী হতে পারে না।
কুরআন তিলাওয়াত মানুষের অন্তরে ঈমানকে শক্তিশালী করে। যখন একজন মুমিন কুরআন পড়ে, তখন সে আল্লাহর নির্দেশনা, হালাল-হারাম এবং পরকালের বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন হয়। এই সচেতনতা তাকে গুনাহ থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করে।

বিশেষ করে শয়তান যখন ওয়াসওয়াসার মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায়, তখন কুরআনের আয়াত স্মরণ করা সেই বিভ্রান্তি দূর করে দেয়।

এছাড়া কুরআন তিলাওয়াত মানুষের অন্তরে প্রশান্তি সৃষ্টি করে, যা তাকে মানসিকভাবে শক্তিশালী করে তোলে। প্রশান্ত অন্তর সহজে শয়তানের প্ররোচনায় প্রভাবিত হয় না। ফলে কুরআন তিলাওয়াত একজন মুমিনের জন্য আত্মিক সুরক্ষা হিসেবে কাজ করে।

সুতরাং, সালাত ও কুরআন তিলাওয়াত একসাথে মানুষের জীবনে এমন একটি শক্তিশালী আত্মিক কাঠামো তৈরি করে, যা তাকে শয়তানের প্রভাব থেকে রক্ষা করে। সালাত মানুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সচেতন করে, আর কুরআন তার অন্তরকে আলোকিত ও পরিশুদ্ধ করে। এই দুটি ইবাদত নিয়মিতভাবে পালন করলে মানুষ ধীরে ধীরে নফসের নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী করতে পারে এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে নিরাপদ জীবন গঠন করতে সক্ষম হয়।

৮. ৩– দোয়া ও ইস্তিগফার :

মানুষের জীবনে শয়তানের প্রভাব থেকে বাঁচার অন্যতম শক্তিশালী আত্মিক মাধ্যম হলো দোয়া ও ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা)। দোয়া হলো আল্লাহর কাছে সরাসরি সাহায্য চাওয়া এবং ইস্তিগফার হলো নিজের গুনাহ স্বীকার করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। এই দুটি ইবাদত মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে, আল্লাহর রহমতের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করে এবং শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও নফসের দুর্বলতা থেকে রক্ষা করে।

প্রথমত, দোয়া মানুষের অন্তরে আল্লাহর ওপর পূর্ণ নির্ভরতা সৃষ্টি করে। যখন মানুষ আল্লাহকে ডাকে, তখন সে নিজের অসহায়ত্ব স্বীকার করে এবং আল্লাহর শক্তির ওপর ভরসা করে। এই অবস্থায় অহংকার, গাফেলতি ও আত্মভরসা কমে যায়, যা শয়তানের প্রভাবকে দুর্বল করে দেয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“আর তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।”
(সূরা গাফির: ৬০)

আল্লাহ আরও বলেন—

“আমি খুব কাছেই আছি; আমি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিই যখন সে আমাকে ডাকে।”
(সূরা আল-বাকারা: ১৮৬)

এই আয়াতগুলো থেকে বোঝা যায় যে, দোয়া বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক তৈরি করে, যা অন্তরকে শক্তিশালী করে এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে দূরে রাখে।

রাসূল ﷺ বলেছেন—

“দোয়াই ইবাদত।”
তিরমিজি—

এছাড়া তিনি ﷺ বলেছেন—

“যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দোয়া করে না, আল্লাহ তার ওপর রাগ করেন।”
তিরমিজি—

রাসূল ﷺ বলেছেন—

“দোয়া তাকদীরকেও পরিবর্তন করতে পারে।”
—ইবন মাজাহ

আরও এসেছে—

"মুসলমানের দোয়া কখনো ফিরিয়ে দেওয়া হয় না; হয় দুনিয়ায় ফল দেওয়া হয়, না হয় আখিরাতে সঞ্চিত রাখা হয়।"
—মুসনাদ আহমদ

উপরিউক্ত হাদিস থেকে বুঝা যায় দুআর গুরুত্ব কত! দুআ আল্লহর সাথে বান্দার একান্ত আলাপন। দুআর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক মজবুত হয়।

দ্বিতীয়ত, ইস্তিগফার মানুষের গুনাহ থেকে ফিরে আসার এবং আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার অন্যতম মাধ্যম। মানুষ ভুল করে এবং গুনাহের কারণে তার অন্তর কঠিন হয়ে যায়। ইস্তিগফার সেই কঠিনতা দূর করে অন্তরকে নরম ও আলোকিত করে। ফলে শয়তানের প্রভাব দুর্বল হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

"**তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিশ্চয়ই তিনি অতীব ক্ষমাশীল।**"
—সূরা নূহ: ১০

আরও বলেন—

"**আর যারা কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং ক্ষমা চায়...**"
সূরা আলে ইমরান: ১৩৫

এই আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, ইস্তিগফার মানুষকে গুনাহ থেকে ফিরে আসার সুযোগ দেয় এবং আল্লাহর রহমতের দরজা খুলে দেয়।

সুতরাং, দোয়া ও ইস্তিগফার মানুষের অন্তরে বিনয় সৃষ্টি করে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করে, গুনাহ থেকে ফিরিয়ে আনে এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা দুর্বল করে দেয়। যে

ব্যক্তি নিয়মিত দোয়া ও ইস্তিগফার করে, সে ধীরে ধীরে নফসের নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী করতে পারে এবং শয়তানের প্রভাব থেকে নিরাপদ জীবন গঠন করতে সক্ষম হয়।

৮.৪– সৎ সঙ্গ:

মানুষের জীবনে শয়তানের প্রভাব থেকে বাঁচার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো সৎ সঙ্গ বা ভালো সঙ্গী নির্বাচন। ইসলামী দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী, মানুষের চরিত্র, চিন্তা-চেতনা এবং আচরণ অনেকাংশে তার সঙ্গীর দ্বারা প্রভাবিত হয়। একজন মানুষ যেমন পরিবেশ ও সঙ্গ গ্রহণ করে, তার জীবনের দিকও তেমনভাবে পরিবর্তিত হয়। তাই সৎ সঙ্গকে শয়তান থেকে বাঁচার একটি বাস্তব ও কার্যকর উপায় হিসেবে গণ্য করা হয়।

প্রথমত, সৎ সঙ্গ মানুষকে নেক কাজের দিকে উৎসাহিত করে এবং গুনাহ থেকে দূরে রাখে। যখন একজন মানুষ নেককার, আল্লাহভীরু এবং ইবাদতকারী মানুষের সাথে চলাফেরা করে, তখন তার মধ্যেও ধীরে ধীরে ভালো অভ্যাস তৈরি হয়। এই ভালো অভ্যাসগুলো নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। বিপরীতভাবে, অসৎ সঙ্গ মানুষকে গাফেলতি ও গুনাহের দিকে টেনে নেয়।

দ্বিতীয়ত, সৎ সঙ্গ মানুষের চিন্তা ও মানসিকতা পরিবর্তন করে। ভালো সঙ্গীর কথা, আচরণ ও জীবনধারা একজন মানুষের অন্তরে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। সে তখন নিজের ভুলগুলো বুঝতে পারে এবং আত্মশুদ্ধির দিকে অগ্রসর হয়। এই পরিবর্তন শয়তানের প্রভাবকে দুর্বল করে, কারণ শয়তান সাধারণত গাফেল ও উদাসীন মানুষের ওপর বেশি প্রভাব বিস্তার করে।

রাসূল ﷺ সঙ্গীর প্রভাব সম্পর্কে বলেছেন—

“মানুষ তার বন্ধুর ধর্মের উপর থাকে, তাই তোমরা দেখো কার সাথে বন্ধুত্ব করছো।” (তিরমিজি)

এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, মানুষের ঈমান, চরিত্র ও জীবনধারা তার বন্ধুত্বের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। তাই সঠিক সঙ্গ নির্বাচন করা ঈমান রক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

তৃতীয়ত, সৎ সঙ্গ মানুষকে আত্মসমালোচনার সুযোগ দেয়। একজন ভালো বন্ধু তার বন্ধুকে ভুল পথে যেতে দেখলে তাকে নরমভাবে সতর্ক করে। এই সতর্কতা মানুষকে গুনাহ থেকে ফিরে আসতে সাহায্য করে এবং শয়তানের ধোঁকা থেকে রক্ষা করে। এটি একটি আত্মিক সহায়তা, যা একা মানুষ অনেক সময় পায় না।

চতুর্থত, অসৎ সঙ্গ মানুষের নফসকে দুর্বল করে এবং ধীরে ধীরে গুনাহকে সহজ করে তোলে। খারাপ সঙ্গীর সাথে থাকলে গুনাহ স্বাভাবিক মনে হয় এবং লজ্জাবোধ কমে যায়। এই অবস্থায় শয়তানের প্রভাব অনেক বেশি কার্যকর হয়। তাই অসৎ সঙ্গ পরিহার করা শয়তান থেকে বাঁচার একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

সুতরাং, সৎ সঙ্গ মানুষের জীবনে একটি শক্তিশালী আত্মিক সুরক্ষা হিসেবে কাজ করে। এটি মানুষকে নেক পথে পরিচালিত করে, নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে দূরে রাখে। যে ব্যক্তি ভালো সঙ্গ নির্বাচন করে, সে ধীরে ধীরে নিজের চরিত্রকে উন্নত করতে পারে এবং ঈমানকে শক্তিশালী করতে সক্ষম হয়।

৯ম অধ্যায়: কিয়ামতের দিন শয়তানের পরিণতি

৯.১– শয়তানের অস্বীকার:

কিয়ামতের দিন মানুষের জীবনের সকল কাজের হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন হওয়ার পর শয়তান ও তার অনুসারীদের মধ্যে সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। দুনিয়ার জীবনে যে শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে, গুনাহের দিকে আহ্বান করেছে এবং মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে—সেই শয়তান কিয়ামতের দিন তার অনুসারীদের সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করবে। এটি হবে মানুষের জন্য এক কঠিন বাস্তবতা এবং বড় শিক্ষণীয় বিষয়।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে এই ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। বিচার সম্পন্ন হওয়ার পর শয়তান মানুষের উদ্দেশ্যে বলবে যে, আল্লাহ সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং তা বাস্তব হয়েছে, কিন্তু সে (শয়তান) যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা। সে স্বীকার করবে যে, তার কোনো সত্যিকারের ক্ষমতা বা জোর প্রয়োগ করার শক্তি ছিল না; বরং সে শুধু মানুষকে আহ্বান করেছিল, আর মানুষ নিজের ইচ্ছায় সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“আর শয়তান বলবে, যখন সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে—নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আর আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম কিন্তু আমি তা ভঙ্গ করেছি...”
(সূরা ইবরাহিম: ২২)

এই আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, শয়তান নিজেকে দায়মুক্ত করার চেষ্টা করবে এবং স্বীকার করবে যে সে শুধু প্ররোচনা দিয়েছে, কিন্তু কাউকে বাধ্য করেনি। বরং মানুষ নিজের ইচ্ছায় তার অনুসরণ করেছে।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

“আমার কোনো ক্ষমতা ছিল না তোমাদের উপর, শুধু আমি তোমাদের ডেকেছি, আর তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছো...”

সূরা ইবরাহিম: ২২

এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, শয়তান কিয়ামতের দিন তার অনুসারীদের থেকে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবে এবং তাদের দায়িত্ব তাদের ওপরই ছেড়ে দেবে। ফলে গুনাহের মূল দায়ভার মানুষের নিজের ওপরই প্রতিষ্ঠিত হবে।

এই অস্বীকারের ঘটনা মানুষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা বহন করে। দুনিয়াতে মানুষ অনেক সময় শয়তানের কুমন্ত্রণা অনুসরণ করে মনে করে যে, সে বাধ্য ছিল বা পরিস্থিতি তাকে চালিত করেছে। কিন্তু কিয়ামতের দিন স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, শয়তান কাউকে বাধ্য করেনি; বরং মানুষ নিজের ইচ্ছায় তার অনুসরণ করেছে।

সুতরাং, কিয়ামতের দিন শয়তানের অস্বীকার প্রমাণ করবে যে সে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু ছিল এবং তার প্রতিশ্রুতি ছিল সম্পূর্ণ প্রতারণা। এই বাস্তবতা মানুষকে দুনিয়াতেই সতর্ক করে দেয়, যাতে সে শয়তানের ধোঁকায় না পড়ে নিজের আমল ও সিদ্ধান্তের ব্যাপারে দায়িত্বশীল থাকে এবং সঠিক পথে অটল থাকে।

৯.২ – অনুসারীদের বক্তব্য —

কিয়ামতের দিন শুধু শয়তানই নয়, বরং তার অনুসারীরাও নিজেদের অবস্থান স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবে এবং গভীর অনুতাপ ও আফসোসে নিমজ্জিত হবে। দুনিয়ার জীবনে যারা শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও প্ররোচনার অনুসরণ করেছিল, তারা সেদিন উপলব্ধি করবে যে তারা একটি ভয়াবহ ধোঁকার শিকার হয়েছিল। এই উপলব্ধি তাদেরকে চরম অনুশোচনায় নিয়ে যাবে, কিন্তু তখন আর কোনো ফিরে যাওয়ার সুযোগ থাকবে না।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে কিয়ামতের দিনের এই অনুতাপের দৃশ্য বর্ণনা করেছেন। মানুষ তখন বলবে—যদি একবার দুনিয়ায় ফিরে যাওয়া যেত, তবে তারা ঈমান আনত এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতো। এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, সত্য স্পষ্ট হওয়ার পর তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে, কিন্তু তা শুধরে নেওয়ার সুযোগ আর থাকবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“হায়! যদি তুমি দেখতে, যখন জালিমরা শাস্তি দেখতে পাবে, তখন তারা বলবে—আমরা কি কোনো উপায় ফিরে যেতে পারি?”

সূরা আশ-শুরা

এছাড়াও আল্লাহ বলেন—

“তারা বলবে—হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! আমরা যদি ফিরে যেতে পারতাম, তবে আমরা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।”
সূরা আশ-শু‘আরা: ১০২

এই আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে, শয়তানের অনুসারীরা কিয়ামতের দিন নিজেদের ভুল সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করবে এবং ভয়াবহ আফসোস প্রকাশ করবে, কিন্তু তখন তাদের অনুতাপ কোনো উপকারে আসবে না।

এই পর্যায়ে শয়তান ও তার অনুসারীদের সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। শয়তান তার আগের মতো কোনো সাহায্য বা প্রতিশ্রুতি দিতে পারবে না; বরং সে নিজের দায় অস্বীকার করবে। ফলে অনুসারীরা বুঝতে পারবে যে তারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়ে শয়তানের পথ অনুসরণ করেছে।

সুতরাং, কিয়ামতের দিন অনুসারীদের বক্তব্য ও অনুতাপ প্রমাণ করবে যে শয়তানের অনুসরণ মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত মানুষ নিজের ভুল নিজেই স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এই বাস্তবতা দুনিয়ার মানুষের জন্য একটি বড় শিক্ষা, যাতে তারা শয়তানের ধোঁকা থেকে দূরে থেকে সঠিক পথকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে।

৯.৩ জাহান্নামের শাস্তি :

কিয়ামতের দিন শয়তান এবং তার অনুসারীদের জন্য সবচেয়ে ভয়াবহ পরিণতি হবে জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি। দুনিয়ার জীবনে যে শয়তান মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়েছে, গুনাহকে সুন্দর করে দেখিয়েছে এবং অহংকারের মাধ্যমে বিভ্রান্ত করেছে—সেই শয়তানকে আল্লাহ তাআলা কঠিন শাস্তির মাধ্যমে অপমানিত করবেন। তার সাথে যারা তার অনুসরণ করেছে, তারাও একই পরিণতির সম্মুখীন হবে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, শয়তান এবং তার অনুসারীদের জন্য জাহান্নামই চূড়ান্ত ঠিকানা। সেখানে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, অনন্ত যন্ত্রণা এবং চিরস্থায়ী লাঞ্ছনা। এই শাস্তি তাদের দুনিয়ার অহংকার, অবাধ্যতা এবং বিভ্রান্তির ফল হিসেবে নির্ধারিত হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

"নিশ্চয়ই জাহান্নাম তোমাদের সকলের প্রতিশ্রুত স্থান—তাদের জন্য যারা তোমাকে অনুসরণ করে তাদের সবাইসহ।"
(সূরা আল-হিজর: ৪৩

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, শয়তান এবং তার অনুসারীদের গন্তব্য একই—জাহান্নাম। দুনিয়াতে তারা একসাথে গুনাহ ও অবাধ্যতার পথে চলেছে, তাই আখিরাতেও তাদের পরিণতি একসাথে নির্ধারিত হয়েছে।

আল্লাহ আরও বলেন—

“***নিশ্চয়ই জাহান্নাম শয়তান ও তার অনুসারীদের জন্য প্রতিশ্রুত স্থান।***”

(সূরা সাদ: ৮৫ এর অর্থগত সারাংশ)

এই শাস্তি শুধু শারীরিক নয়, বরং মানসিক ও আত্মিক লাঞ্ছনাও অন্তর্ভুক্ত করবে। সেখানে তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে, কিন্তু তখন আর কোনো সুযোগ থাকবে না ফিরে আসার বা সংশোধনের।

শয়তানের শাস্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তার চূড়ান্ত অপমান। যে শয়তান দুনিয়াতে অহংকার করে বলেছিল যে সে মানুষকে বিভ্রান্ত করবে, সেই শয়তান কিয়ামতের দিন সম্পূর্ণ পরাজিত ও অপমানিত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। এটি প্রমাণ করবে যে, আল্লাহর বিরুদ্ধে কোনো শক্তির অস্তিত্ব নেই।
সুতরাং, জাহান্নামের শাস্তি হলো শয়তান এবং তার অনুসারীদের চূড়ান্ত পরিণতি। এটি মানুষের জন্য একটি বড় শিক্ষা যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী প্রলোভনের অনুসরণ করে আখিরাতের চিরস্থায়ী শাস্তি অর্জন করা কতটা ভয়াবহ। তাই একজন মুমিনের উচিত শয়তানের পথ থেকে দূরে থেকে আল্লাহর নির্দেশিত পথে অটল থাকা, যাতে সে এই ভয়াবহ পরিণতি থেকে রক্ষা পায়।

৯.৪– শিক্ষণীয় বিষয়:

কিয়ামতের দিন শয়তান ও তার অনুসারীদের পরিণতি থেকে মানুষের জন্য বহু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। এই ঘটনা শুধু একটি ভবিষ্যৎ বাস্তবতা নয়; বরং দুনিয়ার জীবনের জন্য একটি সতর্কবার্তা, যা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করার শিক্ষা দেয়। শয়তানের চূড়ান্ত অস্বীকার, অনুসারীদের অনুতাপ এবং জাহান্নামের শাস্তি—সব মিলিয়ে এটি মানবজাতির জন্য গভীর আত্মসমালোচনার সুযোগ সৃষ্টি করে।

প্রথমত, এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয় যে শয়তান মানুষের প্রকৃত শত্রু। সে দুনিয়াতে মানুষকে প্রতারণা করে, গুনাহকে সুন্দর করে দেখায় এবং মিথ্যা আশ্বাস দেয়। কিন্তু কিয়ামতের দিন সে সব দায় অস্বীকার করবে এবং নিজের কোনো দায়িত্ব নেবে না। তাই মানুষকে বুঝতে হবে যে, শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব বা তার অনুসরণ কখনো কল্যাণ বয়ে আনে না।

দ্বিতীয়ত, মানুষ নিজের কাজের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী। কিয়ামতের দিন শয়তান বলবে যে সে শুধু আহ্বান করেছে, কিন্তু মানুষ নিজের ইচ্ছায় সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। এই সত্য থেকে বোঝা যায় যে, কোনো গুনাহের দায় অন্যের ওপর চাপানো যাবে না; বরং প্রত্যেক মানুষকে তার নিজের কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

তৃতীয়ত, দুনিয়ার প্রলোভন ক্ষণস্থায়ী হলেও তার পরিণতি চিরস্থায়ী হতে পারে। শয়তান মানুষের সামনে সাময়িক আনন্দ ও সুবিধা উপস্থাপন করে, কিন্তু তার শেষ পরিণতি হয় জাহান্নাম। তাই একজন মুমিনকে দুনিয়ার অস্থায়ী আকর্ষণ ও আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের মধ্যে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

চতুর্থত, অনুতাপ তখন কোনো উপকারে আসে না যখন সিদ্ধান্তের সময় শেষ হয়ে যায়। কিয়ামতের দিন অনুসারীরা চরম আফসোস করবে, কিন্তু তখন আর ফিরে আসার কোনো সুযোগ থাকবে না। এটি মানুষকে শেখায় যে, দুনিয়াতেই তওবা ও সংশোধনের সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে।

পঞ্চমত, ঈমান ও নেক আমলই একমাত্র মুক্তির পথ। শয়তান যতই শক্তিশালী প্রভাব দেখাক না কেন, আল্লাহর নির্দেশনা অনুসরণকারী মানুষ তার প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। সালাত, যিকির, দোয়া এবং সৎ সঙ্গ মানুষকে শয়তানের পথ থেকে রক্ষা করে।

সুতরাং, কিয়ামতের দিনের এই বাস্তবতা মানুষের জন্য একটি বড় শিক্ষার বিষয়। এটি মানুষকে সতর্ক করে দেয় যে, শয়তানের অনুসরণ ধ্বংসের পথ এবং আল্লাহর আনুগত্যই মুক্তির একমাত্র উপায়। যে ব্যক্তি এই শিক্ষা গ্রহণ করে, সে দুনিয়াতেই

নিজের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হয় এবং আখিরাতে সফলতা অর্জন করে।

১০ম অধ্যায়: বর্তমান সমাজে শয়তানের প্রভাব

১০.১– সোশ্যাল মিডিয়া ও শয়তানের প্রভাব:

বর্তমান যুগে শয়তানের প্রভাবের অন্যতম শক্তিশালী ক্ষেত্র হলো সোশ্যাল মিডিয়া। প্রযুক্তির এই উন্নত মাধ্যম মানুষের জীবনকে সহজ করার পাশাপাশি নৈতিকতা, ঈমান এবং আত্মিক অবস্থার ওপর গভীর প্রভাব ফেলছে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, শয়তান এই মাধ্যমকে ব্যবহার করে মানুষকে ধীরে ধীরে গাফেলতি, অশ্লীলতা এবং আল্লাহ থেকে দূরত্বের দিকে নিয়ে যায়।

প্রথমত, সোশ্যাল মিডিয়া মানুষের সময়কে অপচয়ের দিকে নিয়ে যায়। অপ্রয়োজনীয় ভিডিও, পোস্ট ও কনটেন্ট মানুষকে দীর্ঘ সময় ব্যস্ত রাখে, ফলে সালাত, কুরআন তিলাওয়াত এবং অন্যান্য ইবাদতের প্রতি অবহেলা সৃষ্টি হয়। এই অবহেলাই শয়তানের অন্যতম বড় সুযোগ, কারণ গাফেল মন সহজেই তার ওয়াসওয়াসার শিকার হয়।

দ্বিতীয়ত, সোশ্যাল মিডিয়ায় অশ্লীলতা ও গুনাহকে সহজভাবে উপস্থাপন করা হয়। অনেক কনটেন্টে এমন বিষয় থাকে যা নফসকে উত্তেজিত করে এবং হারামের প্রতি আকৃষ্ট করে। শয়তান এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে মানুষের দৃষ্টি, চিন্তা ও অনুভূতিকে ধীরে ধীরে পাপের দিকে নিয়ে যায়। ফলে গুনাহ স্বাভাবিক মনে হতে শুরু করে।

তৃতীয়ত, সোশ্যাল মিডিয়া মানুষের তুলনা ও হিংসা বৃদ্ধি করে। অন্যের জীবন, সম্পদ বা সফলতা দেখে মানুষের অন্তরে হিংসা, দুঃখ বা অসন্তোষ তৈরি হয়। এই মানসিক অবস্থাও শয়তানের প্রভাবকে শক্তিশালী করে, কারণ অসন্তুষ্ট হৃদয় আল্লাহর শুকরিয়া থেকে দূরে সরে যায়।

চতুর্থত, সোশ্যাল মিডিয়ায় অতিরিক্ত আসক্তি মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দুর্বল করে দেয়। যখন মানুষ নিজের সময় ও মন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, তখন তার নফস সহজেই শয়তানের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। ফলে সে ধীরে ধীরে গাফেল ও উদাসীন জীবনযাপন করতে শুরু করে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন—

“আর শয়তান তোমাদেরকে দরিদ্রতার ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়।”
সূরা আল-বাকারা: ২৬৮

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, শয়তান মানুষের মনে ভয়, লোভ ও অশ্লীল চিন্তা সৃষ্টি করে, আর বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়া এই প্রভাব বিস্তারের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে।

সুতরাং, সোশ্যাল মিডিয়া যদি নিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহার না করা হয়, তবে এটি শয়তানের জন্য একটি বড় মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে। তাই একজন মুমিনের উচিত এই মাধ্যম ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সচেতন থাকা, সময় নিয়ন্ত্রণ করা এবং অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকা, যাতে সে শয়তানের প্রভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে।

১০.২–অশ্লীলতা, চোখের গুনাহ ও গাফেলতি :

বর্তমান সমাজে শয়তানের প্রভাব বিস্তারের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হলো অশ্লীলতা, চোখের গুনাহ এবং গাফেলতি (heedlessness)। এই তিনটি বিষয় মানুষের ঈমান, আমল এবং ইবাদতের ওপর সরাসরি ও গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। আধুনিক প্রযুক্তি, সোশ্যাল মিডিয়া এবং চারপাশের পরিবেশের মাধ্যমে শয়তান মানুষকে ধীরে ধীরে এমন অবস্থার দিকে নিয়ে যায়, যেখানে লজ্জা, তাকওয়া এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে পড়ে।

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ দিয়েছেন, কারণ দৃষ্টি হলো অন্তরের দরজা। এই দরজা দিয়ে হারাম প্রবেশ করলে অন্তর ধীরে ধীরে কলুষিত হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“মুমিনদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান হিফাজত করে; এটিই তাদের জন্য অধিক পবিত্র।”
(সূরা আন-নূর: ৩০)

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, দৃষ্টি সংযত রাখা শুধুমাত্র একটি নৈতিক নির্দেশ নয়; বরং এটি ঈমান রক্ষার একটি মৌলিক অংশ। কারণ চোখের মাধ্যমে যা দেখা হয়, তা সরাসরি অন্তরে প্রভাব ফেলে এবং চিন্তা-চেতনাকে পরিবর্তন করে।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

“তোমরা যা জানো না তার অনুসরণ করো না; নিশ্চয়ই কান, চোখ ও হৃদয়—সবকিছুই জিজ্ঞাসিত হবে।”
সূরা আল-ইসরা: ৩৬

এই আয়াত মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহের দায়িত্বশীল ব্যবহারকে গুরুত্ব দিয়েছে। চোখ যদি নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে তা গুনাহের দিকে নিয়ে যায় এবং পরবর্তীতে অন্তরের জবাবদিহির কারণ হয়।

প্রথমত, চোখের গুনাহ হলো শয়তানের সবচেয়ে সহজ প্রবেশপথগুলোর একটি। হারাম দৃষ্টি মানুষের অন্তরে ধীরে ধীরে খারাপ চিন্তা, কল্পনা এবং কামনা সৃষ্টি করে। শুরুতে এটি সামান্য মনে হলেও, বারবার গুনাহপূর্ণ দৃশ্য দেখার ফলে অন্তর ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে যায়। তখন পাপকে আর পাপ হিসেবে অনুভব করা যায় না, বরং তা স্বাভাবিক ও গ্রহণযোগ্য মনে হতে শুরু করে। এই অবস্থায় শয়তান মানুষের চিন্তা ও অনুভূতির ওপর সহজে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

দ্বিতীয়ত, অশ্লীলতা মানুষের ঈমানকে ধীরে ধীরে দুর্বল করে দেয়। অশ্লীল দৃশ্য, কথা বা পরিবেশ মানুষের অন্তর থেকে লজ্জা ও তাকওয়ার অনুভূতি কমিয়ে দেয়। লজ্জা

কমে গেলে গুনাহ সহজ হয়ে যায় এবং ঈমানের আলো ধীরে ধীরে ম্লান হতে থাকে। ফলে মানুষ নেক আমলের প্রতি আগ্রহ হারায় এবং দুনিয়ার আকর্ষণে বেশি নিমগ্ন হয়ে পড়ে।

তৃতীয়ত, গাফেলতি বা আল্লাহ থেকে উদাসীনতা হলো শয়তানের সবচেয়ে শক্তিশালী সুযোগ। যখন মানুষ আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে থাকে, সালাত, কুরআন ও দোয়ার প্রতি অবহেলা করে, তখন তার অন্তর শূন্য হয়ে যায়। এই শূন্যতা শয়তানের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে। তখন সে সহজেই মানুষের চিন্তা, সময় ও ইচ্ছার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

"আর যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ থাকবে, তার জন্য রয়েছে সংকীর্ণ জীবন, এবং কিয়ামতের দিন তাকে অন্ধ অবস্থায় উঠানো হবে।"
(সূরা ত্ব-হা: ১২৪)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে থাকা শুধু আখিরাতের ক্ষতি নয়; বরং দুনিয়াতেও মানসিক অস্থিরতা, অশান্তি এবং বিভ্রান্তির কারণ হয়।

এই তিনটি বিষয়—চোখের গুনাহ, অশ্লীলতা এবং গাফেলতি—একসাথে মানুষের জীবনে ভয়াবহ প্রভাব ফেলে। এগুলোর প্রভাবে মানুষের ঈমান দুর্বল হয়ে যায়, কারণ অন্তরের পরিশুদ্ধতা নষ্ট হয় এবং আল্লাহভীতি কমে যায়। আমলে অলসতা আসে, কারণ গুনাহের অভ্যাস মানুষকে ইবাদত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। আর ইবাদতে মনোযোগ কমে যায়, কারণ অন্তর দুনিয়ার আকর্ষণ ও বিভ্রান্তিতে ব্যস্ত থাকে।

ফলে মানুষ ধীরে ধীরে আত্মিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং শয়তানের প্রভাব তার জীবনে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। শয়তান তখন এই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে আরও গভীর গুনাহে লিপ্ত করে।

সুতরাং, চোখের গুনাহ, অশ্লীলতা এবং গাফেলতি হলো এমন ভয়াবহ আত্মিক রোগ, যা একজন মুমিনের ঈমান, আমল ও ইবাদত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে। তাই একজন মুমিনের উচিত দৃষ্টি সংযত রাখা, অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকা, আল্লাহর স্মরণে নিয়োজিত থাকা এবং গাফেলতি থেকে নিজেকে রক্ষা করা, যাতে সে শয়তানের প্রভাব থেকে নিরাপদ জীবন গঠন করতে পারে এবং আখিরাতে সফলতা অর্জন করতে পারে।

১০.৩ মূল্যবোধের অবক্ষয় :

বর্তমান সমাজে শয়তানের প্রভাবের আরেকটি ভয়াবহ দিক হলো ইসলামি মূল্যবোধের অবক্ষয়। ইসলাম যে নৈতিকতা, লজ্জাশীলতা, সততা, পর্দা, তাকওয়া এবং দায়িত্ববোধের শিক্ষা দিয়েছে, আধুনিক সমাজে ধীরে ধীরে তা দুর্বল হয়ে পড়ছে। শয়তান মানুষের চিন্তা ও জীবনধারার ওপর প্রভাব বিস্তার করে এই মূল্যবোধগুলোকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে, যাতে মানুষ আল্লাহর নির্দেশনা থেকে দূরে সরে যায়।

প্রথমত, লজ্জাশীলতা (হায়া) ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন মাধ্যমের মাধ্যমে লজ্জাহীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অশ্লীলতা, খোলা আচরণ এবং গুনাহকে স্বাভাবিকভাবে উপস্থাপন করার ফলে মানুষের অন্তর থেকে লজ্জাবোধ কমে যাচ্ছে। লজ্জা কমে গেলে গুনাহ করা সহজ হয়ে যায়, এবং শয়তান তখন মানুষের ওপর আরও বেশি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

দ্বিতীয়ত, সততা ও আমানতদারিতার অভাব সমাজে নৈতিক অবক্ষয়ের একটি বড় কারণ। মানুষ যখন ছোট ছোট কাজে মিথ্যা, প্রতারণা এবং অবহেলা শুরু করে, তখন তা ধীরে ধীরে বড় অপরাধে রূপ নেয়। শয়তান এই ছোট গাফেলতিগুলোকে বড় পাপে পরিণত করে মানুষের ঈমান ও চরিত্র দুর্বল করে দেয়।

তৃতীয়ত, পরিবার ও সমাজের মধ্যে দায়িত্ববোধ কমে যাওয়া ইসলামি মূল্যবোধের অবক্ষয়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ইসলাম পরিবারকে একটি পবিত্র কাঠামো হিসেবে গঠন করেছে, কিন্তু বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে এই বন্ধন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। পিতা-

মাতার অবাধ্যতা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া এবং সামাজিক দায়িত্ব এড়িয়ে চলা—এসবই শয়তানের প্রভাবকে বৃদ্ধি করে।

চতুর্থত, ইবাদতের প্রতি অবহেলা ইসলামি মূল্যবোধ ধ্বংসের অন্যতম প্রধান কারণ। সালাত, কুরআন তিলাওয়াত এবং অন্যান্য ইবাদতের প্রতি অনীহা মানুষের অন্তরকে কঠিন করে দেয়। যখন অন্তর কঠিন হয়ে যায়, তখন নৈতিকতা ও তাকওয়ার অনুভূতি কমে যায় এবং মানুষ ধীরে ধীরে গাফেল হয়ে পড়ে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন—

"নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।"
(সূরা আল-আনকাবুত: ৪৫

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, ইসলামি মূল্যবোধ রক্ষা করতে ইবাদত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ইবাদত দুর্বল হলে মূল্যবোধও দুর্বল হয়ে যায়।

আরও আল্লাহ বলেন—

"নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু, তাই তোমরা তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ করো।"
—সূরা ফাতির:৬

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, শয়তান সবসময় চেষ্টা করে সমাজের নৈতিক ভিত্তি দুর্বল করতে এবং মানুষকে ধীরে ধীরে ইসলামি মূল্যবোধ থেকে দূরে সরাতে।
সুতরাং, ইসলামি মূল্যবোধের অবক্ষয় হলো বর্তমান সমাজে শয়তানের একটি বড় সফল কৌশল। তাই একজন মুমিনের উচিত লজ্জাশীলতা বজায় রাখা, সত্যবাদিতা ও আমানতদারিতা রক্ষা করা, পারিবারিক দায়িত্ব পালন করা এবং ইবাদতের প্রতি যত্নবান থাকা, যাতে সে নিজে এবং সমাজ—দুইই শয়তানের প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকতে পারে।

উপসংহার –)

সার্বিক আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, শয়তান মানুষের চিরস্থায়ী শত্রু, যে দুনিয়ার জীবন থেকে শুরু করে আখিরাত পর্যন্ত মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। কুরআন ও হাদিসের আলোকে স্পষ্ট হয় যে, শয়তান মানুষের ঈমান দুর্বল করা, ইবাদত থেকে দূরে রাখা এবং গুনাহকে সুন্দর করে দেখানোর মাধ্যমে তাকে ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়।

উপরিউক্ত আলোচিত বিভিন্ন অধ্যায়ের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, শয়তান প্রথমে মানুষের অন্তরে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করে, এরপর তাকে ছোট ছোট গুনাহের দিকে ধাবিত করে এবং ধীরে ধীরে বড় পাপে নিমজ্জিত করে। বিশেষ করে চোখের গুনাহ, অশ্লীলতা, গাফেলতি এবং অসৎ সঙ্গ—এসব মাধ্যম ব্যবহার করে শয়তান মানুষের ঈমান ও চরিত্রকে দুর্বল করে দেয়।

এছাড়াও বর্তমান সমাজে শয়তানের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। সোশ্যাল মিডিয়া, অশ্লীল পরিবেশ এবং ইসলামি মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মাধ্যমে শয়তান তরুণ সমাজকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করে তাদের জীবনধারাকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করছে। এর ফলে অনেক মানুষ ইবাদত থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং দুনিয়ার মোহে নিমজ্জিত হচ্ছে।

তবে এই সবকিছুর মাঝেও একজন মুমিনের জন্য মুক্তির পথ রয়েছে। সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, দোয়া, ইস্তিগফার, যিকির এবং সৎ সঙ্গ—এসবই শয়তানের প্রভাব থেকে বাঁচার শক্তিশালী মাধ্যম।

যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে আল্লাহর স্মরণে থাকে এবং তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে, সে শয়তানের ধোঁকা থেকে নিরাপদ থাকতে পারে।
পরিশেষে বলা যায়, শয়তানের পথ ধ্বংসের পথ এবং আল্লাহর পথই একমাত্র মুক্তির পথ। তাই একজন মুমিনের উচিত সবসময় নিজের ঈমানকে শক্তিশালী রাখা, গুনাহ

থেকে দূরে থাকা এবং আল্লাহর নির্দেশিত পথে অটল থাকা, যাতে সে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জন করতে পারে।